ফয়সলা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৭০

প্রচ্ছদ : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ
নিউ কমলা প্রেস
৫৭.২, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মনা আর দোলাকে

মামাকে আমি বরাবরই খুব ভালবাসি বটে, কিন্তু মনে মনে তাকে আধা পাগলগোছের খামখেয়ালী মজার মানুষ ভাবি। মনে মনে ভাবি মায়ের ভয়ে। মা আমাকে বেশি ভালবাসে কি মামাকে, তাও অনেক সময় ঠিক করে উঠতে পারি না। আমি মায়ের একমাত্র ছেলে আর মামা মায়ের একমাত্র আদরের ছোট ভাই। আমার বাবা নেই আর মামার বউ নেই। বউ নেই বলতে মামা বিয়েই করেনি। আর করবে সে আশাও দেখি না। কারণ, মামা আমার থেকে বাইশ বছরের বড়। আমার এখন ছাব্বিশ আর মামার আট-চল্লিশ।

মায়ের কাছে আমরা দুটিই যেন না-বালক পোষ্য। মা আমাকে এখনো বাচ্চা ছেলের মতোই ধমক ধামক করে আর বেচাল দেখলে আটচল্লিশ বছরের ভাইয়ের দিকেও ভ্রূকুটি করে তাকায়। ফলে বাইশ বছরের তফাত সত্ত্বেও আমি আর মামা যেন সম-বয়সী দুটি প্রাণী। মা সামনে না থাকলে দু'জনার কারো মুখেই লাগাম নেই। দু'জনে মিলে অনেক হাসি-মসকরা আর অনেক রকমের কাণ্ডমাণ্ড করে থাকি।

দিন কতক মাত্র আগের কথা। প্রায় ছ'মাস বাদে মামা হঠাৎ ভুঁইফোঁড় হয়ে বাড়িতে উদয় হয়েছে। সকালে মায়ের তাড়ায় বিছানা ছেড়ে চোখে মুখে একটু জল দিয়ে চায়ের টেবিলে বসতে গিয়ে দেখি, লোমশ দু'খানা হাতে ধরা খোলা খবরের কাগজে এক-জনের আপাদ মস্তক আড়াল। কাগজ পড়ার এই স্পেশাল পোজ বহুকালের চেনা। আনন্দে আটখানা হয়ে আমি বড়সড় লাফ মারলাম একটা, রঙ্গ মামা তুমি না তোমার ভূত?

মুখ থেকে খবরের কাগজ সরল আস্তে আস্তে। সেই খুশি-খুশি বোকা-বোকা মুখ, হাসি চিক-চিক ছোট ছোট চোখ, আর রসে টিপ-

টিপ পুরু দুই ঠোঁট। মারাঠীদের সাধারণত টানা চোখ, পাতলা ঠোঁট হয়। আমার মায়ের দুই চোখ এখনো দেখার মতো। কিন্তু মামা রঙ্গরাজ চন্দ্রভানকরের চেহারা-পত্র, মুখের আদল, সবকিছু একেবারে স্বতন্ত্র। ভদ্রলোক নিজেই বলে, আমি হচ্ছি কুলের কুলাঙ্গার, আমার সবকিছু একেবারে নিজস্ব।

আমার আনন্দ দেখে আর কথা শুনে খবরের কাগজ দিয়ে মা-কে আড়াল করে মামা চোখ পিটপিট করে বলল, ভেতো বাঙালী, দিনে দুপুরে ভূত দেখছে। উঠতে এত বেলা, কাল রাতে ক'থালা ভাত মেরেছিলি ?

আমি চেয়ার টেনে বসতে বসতে মায়ের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলাম, মা, মামা আমাকে ভেতো বাঙালী বলছে।

যেন আমার থেকে মায়ের গায়েই বেশি ফোসকা পড়ার কথা। মা-কে বেশি হাসতে দেখিনে কখনো। মন মেজাজ তেমন ভালো থাকলে একটু আধটু মুখ টিপে হাসে। কিন্তু মামার সঙ্গে আমার জাত নিয়ে ঠেসা-ঠেসি শুরু হলে মা একটু বেশিই হাসে। তখন ভারী সুন্দর দেখায় মা-কে। আমাদের দিকে খাবারের ডিশ এগিয়ে দিতে দিতে পলকা গাম্ভীর্যে মা বলল, ছ'মাস বাদে বাড়িতে পা দিয়েই সামনের বারান্দার এক ভেতো বাঙালীর ফোটোর গলায় টাটকা গোলাপের মালাটা কে পরিয়ে দিল তোর মারাঠী মামাকে জিগ্যেস কর।

চট করে উঠে সামনের সাজানো গোছানো ঢাকা বারান্দায় এলাম। সিঁড়ির মুখে দেয়ালে বাবার মস্ত অয়েল পেন্টিং ছবি। যে কোনো লোক সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেই আগে ওই ছবির দিকে চোখ পড়বে। নৌ বহরের পদস্থ অফিসারের প্যান্ট কোট টুপি ব্যাজ পরা এক জীবন্ত মানুষ যেন দাঁড়িয়ে আছে, ঝকঝক করছে দু' চোখ। বাবার এই দৃপ্ত মূর্তিখানা আমার গর্বের বস্তু। ওই ছবিতে বিশাল একখানা টাটকা গোলাপের মালা ঝুলছে। গোলাপ ফুল নাকি বাবার বড় প্রিয় ছিল। কিপটে রঙ্গ মামা চোখে পড়ার মতো

গোলাপের মালা দেখলে যত দামই হোক সেটা কিনে এনে বাবার ফোটোতে পরিয়ে দেবে।

এখানে বলে রাখি, আমার মা মারাঠী মেয়ে, কিন্তু বাবা বাঙালী। বিয়ের আগে, মায়ের নাম ছিল লীলা চন্দ্রভানকর, এখন লীলা তরফদার। বাবার নাম বিনায়ক তরফদার। মা-বাবার বিয়ে হয়েছিল বিলেতে, আমার জন্মও সাগর পারের মাটিতে। বাবা ছিল বিদেশী জাহাজের নামজাদা ক্যাপ্টেন। মামার মতে অত অল্প বয়সে খুব কম লোকই এত বড় হতে পেরেছে। বাবাকে আমার একটুও মনে নেই। মাত্র ছ'বছর বয়সে তাকে হারিয়েছি। বাবার তখন আটত্রিশ বছর মাত্র বয়েস। আঠের হাজার টনের পেল্লায় কারগো জাহাজ 'স্ট্রীম-লাইন' নিয়ে লিসবন থেকে দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছিল। এক ঝড়ের রাতের ভয়াল দুর্যোগে মাঝ দরিয়ায় 'স্ট্রীম-লাইন' ডুবে যায়। অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের তলায় হাজার হাজার ছোট বড় চোরা পাহাড়। ঠাণ্ডা স্বাভাবিক দিনেই পাকা ক্যাপ্টেনের তত্ত্বাবধানে খুব সাবধানে জাহাজ নিয়ে যেতে হয়। রঙ্গ মামার মুখে শুনেছি, সেই দুর্যোগের রাতে বিশাল 'স্ট্রীম-লাইনে'র অবস্থা হয়েছিল নাকি নোঙর-ছেঁড়া পলকা নৌকোর মতো। তীরের মতো ছুটে চলেছিল, দিকের কোনো দিশা ছিল না, এক মাত্র বাবা ছাড়া সমস্ত নাবিকরা ইষ্ট মন্ত্র জপতে শুরু করেছিল। আচমকা এক প্রচণ্ড সংঘাতে প্রলয়ের শেষ ঘনালো। চোরা পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জাহাজের একদিকে নীচে থেকে ধার পর্যন্ত দু'ফাঁক। অত বড় জাহাজটা সমুদ্রের নিচে অদৃশ্য হয়ে যেতে চব্বিশ মিনিট মাত্র সময় লেগেছিল। জাহাজের বাহাত্তর জন নাবিকের মধ্যে একজন মাত্র জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার প্রায় অলৌকিকভাবেই প্রাণে বেঁচে গেছল। সেই ইঞ্জিনিয়ার আমার মামা রঙ্গরাজ চন্দ্রভানকর।

হাসি মুখে আবার চায়ের টেবিলে ফিরে এলাম। মায়ের কাছে জব্দ হয়ে মামা গম্ভীর মনোযোগে দেড়খানা প্লেট খালি করে ফেলেছে। ওই প্লেট শেষ হলে আমার প্লেটের দিকেও হাত বাড়াতে

পারে ভেবে নিজের খাদ্য সামগ্রী কাছে টেনে নিলাম। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও রঙ্গ মামা তার জাত-ছাড়া মানুষ, হেন জিনিস নেই যা অম্লানবদনে জঠরে চালান করতে পারে না। নিজেই পেট-চাপড়ে বলে, তেমন খিদে পেলে আর ধরা পড়ার ভয় না থাকলে দু'পেয়ে মানুষকেও এখানে আশ্রয় দিতে পারি।

অদূরে দাঁড়িয়ে বোম্বেটে সভয়ে মামার খাওয়া দেখছিল। মামাকে খেতে দেখলেই ও ওই রকম ভয়-ভয় মুখ করে চেয়ে থাকে। আসলে ব্যাটা জানে অমন মুখ করে থাকলে মামা খুশি হয়, নইলে দুনিয়ার কোনো কিছুতে ওর ভয়-ডর আছে বলে মনে হয় না। তবে সমীহ একমাত্র মামাকেই করে বটে। মা রেগে গেলেই বোম্বেটেকে বাড়ি থেকে দূর হয়ে যেতে বলে। ও গটগট করে তখন আমার ঘরে চলে আসে। আবার আমি তেড়ে উঠলে তক্ষুণি মায়ে কাছে গিয়ে তড়পায়, আমি চললাম এ বাড়ি থেকে, দাদা আমাকে মারতে এসেছিল। তারপরেই দুমদুম করে কাজ শুরু করে, অর্থাৎ কাজ শেষ হলে আর এক মুহূর্তও এ বাড়ি থাকবে না।

বোম্বেটে আমাদের বহুদিনের খাস চাকর। ওর আট ন'বছর বয়েসে মামা এই বোম্বাই শহরেরই কোথা থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছিল। ও-ব্যাটা তখন নিজের নামটাও ঠিক ঠিক বলতে পারে না। মামাই ওর নাম দিয়েছিল বোম্বেটে, সেই থেকে এই নামই চালু। এখন ওর বয়স চব্বিশ, আমার থেকে মাত্র দু'বছরের ছোট। জোয়ান সোমত্ত মানুষ, কুস্তি লড়ার সময় ওকে ঘায়েল করতে গিয়ে এক এক সময় নিজেরই নাজেহাল অবস্থা হয়। আমার ধারণা ও আমার পেস্তা বাদাম আখরোট কিশমিশ দু'হাতে সরায়, নইলে দিনকে দিন অমন অসুরপানা হয়ে উঠেছে কি করে? একবার হাতে-নাতে ধরা পড়তে বলেছিল, শরীরটা কেমন মিইয়ে যাচ্ছে দেখে মা বলল, খেয়ে দেয়ে তাজা হয়ে নে, তাই—মা-কে জিগ্যেস করতে মা হেসে ফেলে বলেছিল, ওকে দে ধরে দু'ঘা। সেই থেকে ওর জন্যেও আমি কিছুটা পেস্তা বাদাম বরাদ্দ করেছি, কিন্তু বরাদ্দর বাইরেও

কতটা সাবড়ে যাচ্ছে জানব কি করে! জিনিস কেনে ও, আর থাকেও ওর হেপাজতেই।

খাওয়া শেষ করে রঙ্গ মামা শূন্য ডিশ দুটোর দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েই কটমট করে বোম্বেটের দিকে তাকালো। এই, এদিকে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে একটা লাফ দিয়ে বোম্বেটে একেবারে মায়ের চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ভাবখানা যেন ডবল ঘাবড়ে গেছে, কাছে গেলেই মামা ওকে জল দিয়ে চিবিয়ে খাবে বুঝি।

কাণ্ড দেখে গম্ভীর মায়েরও না হেসে উপায় নেই। মামাকে জিগ্যেস করল, তোকে আর কিছু দেবে?

মামা আর এক দফা কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, এখন শুধু দু' গেলাস গরম কফি, দুপুরে মেপে দেড় কিলো মাটন কোর্মার বাটি আমার সামনে না দেখলে ওর মুণ্ডু চিবুবো বলে দিলাম। কাল রাতে জাহাজের হতচ্ছাড়ারা একটা মাত্র মুর্গির রোস্ট দিয়ে কলা দেখিয়েছে।

বোম্বেটে এবার দু'লাফে রান্না ঘরে সেঁধিয়ে গেল। মা হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোর আর বয়েস হল না। বোস তোরা, আমি কাজকর্ম সেরে নিই, আজ আবার গোড়ার দিকেই ক্লাস আছে—

আমার বিলেত ফেরত শিক্ষিতা মা এই বোম্বাইয়ের এক নাম-করা মেয়ে স্কুলের হেডমিসট্রেস, কিন্তু তার ঘরের আচার আচরণ খাঁটি হিন্দু ঘরের বিধবার মতো। স্নান সেরে পুজোর ঘরের জপতপ শেষ না করে জল স্পর্শও করবে না। আমি তার একমাত্র ছেলে, এখানকার নামজাদা অ্যাথলেট, বক্সিং চ্যামপিয়ন, আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী জলক্রীড়াবিদ, যাকে বলে ওয়াটার স্পোর্টস ম্যান। গভীর সমুদ্রে ড্রাইভিং, এক নাগাড়ে আশি ঘণ্টা জলে ভেসে থাকা, জেলেদের ডিঙি নৌকো নিয়ে দূরে দূরে মাছ ধরতে চলে যাওয়া, এইসব জলজ ব্যাপারে আমি ওস্তাদ গোছের একজন। বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে

আমাকে মিস্টার অ্যাকোয়াটিক বলে ডেকে থাকে। এ-হেন বহু-গুণধর আমিও মায়ের দিকে তাকালে কেমন মনে হয়, মা যেন আমার থেকে ঢের বেশি শক্তি ধরে। কিন্তু সেটা যে কোন ধরনের শক্তি আমি ঠাওর করে উঠতে পারি না।

মা চলে যেতে আমি রঙ্গ মামার মুখোমুখি হলাম। এবারে কোত্থেকে এলে আর কত দিনের জন্যে এলে?

ছোট একটা হাই তুলে মামা জবাব দিল, এলাম লিসবন থেকে, আর কতদিনের জন্যে এলাম সেটা তোর ওপর নির্ভর করছে।

শেষের জবাবটা শুনে আমার একটু অবাক হবার কথা। কিন্তু লিসবন থেকে আসছে শুনে ঠাট্টার সুরে বলে উঠলাম, আবার লিসবন! ক'বার হল লিসবন, এক ডজন?

না, ন'বার।

বোম্বেটে ছেলে তুলে কফির পট নিয়ে এলো। মামাকে বড় গেলাস আর আমাকে কাপে কফি ঢেলে দিল। তারপর ও কোন দিকে গেল ঠিক খেয়াল করিনি। আমি সাগ্রহে জিগ্যেস করলাম, কি ব্যাপার ঠিক ঠিক বলো দেখি মামা, বার বার লিসবন কেন, তোমার ইয়ে, মানে আমার সেই হতে-পারে গোছের মামী কি সেখানকার মেয়ে নাকি?

জবাব না দিয়ে রঙ্গ মামা নিরীহ মুখে টেবিল থেকে চামচেটা তুলে নিল, তারপর বার কয়েক ওটা নাড়া-চাড়া করে চট করে ঘুরেই ধাঁ করে ছুঁড়ে মারল। উঃ! সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ একটা।

চেয়ে দেখি পিছনে কোণের দিকে বড় একটা ঝাড়ন হাতে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে মিটসেফের তলা মুছছে বোম্বেটে, মাথায় আচমকা চামচের বাড়ি খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে উঠে দাঁড়াল। মামা হুমকি দিয়ে উঠল, ব্যাটা, কথা শোনার জন্য জিভের জল খসছে, কেমন? বেরো!

বোম্বেটে পালালো।

এখানে বলে রাখি, আমাদের এখানকার বাড়ির সর্বক্ষণের

কথাবার্তার ভাষা বাংলা। মা প্রফেসার রেখে বাংলা শিখেছিল আর সেই প্রফেসারকে আমার ঘাড়েও চালান করেছিল। বাংলা ভাষার ওপর মায়ের এত দরদ কেন সেটা অনুভব করতে পারি। আর আমি বাঙালীর ছেলে, ঘুমোলে স্বপ্নটা পর্যন্ত আমার বাংলায় দেখা উচিত বলে মায়ের বিবেচন। মামাও নাকি মায়ের বিয়ের পর থেকেই বাংলা শেখা শুরু করেছিল, এখন তো কথা কইলে কেউ ধরতেও পারবে না মামা বাঙালী কি অবাঙালী। বাংলা ছাড়া মামা আরো অনেকগুলো ভাষা বলতে কইতে পারে। আর এত বছর ধরে শুনে শুনে বোম্বেটেও বাংলা বলা-কওয়াটা মোটামুটি রপ্ত করেছে। বেফাঁস দু-একটা কথা বলে ফেলে অবশ্য, আর, সে-জন্যে মায়ের কাছে ধমক খেয়ে আমার কাছে এসে জেনে নেয় কথাটা কি হবে। বম্বেতে থাকার ফলে বোম্বেটে ইংরেজী কথাবার্তা একটু আধটু বুঝতে পারে, আর টুকটাক ইংরেজী দু'চারটে কথা বলতেও পারে। বাংলার থেকে ওর ইংরেজী বলার ঝোঁক বেশি।

রঙ্গ মামা হাসতে হাসতে আমার দিকে ফিরল, তারপর লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, এবারে তোর সেই হতে-পারে মামীর হদিস পাওয়ার ব্যবস্থা একরকম করেই এসেছি রে, তার অজ্ঞাতবাসের কাল ফুরিয়েছে।

আমাদের মামা-ভাগ্নের আলোচনার মধ্যে কোনোরকম সঙ্কোচের বালাই নেই। আমি নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলাম। কোথাও না কোথাও মামার একটি প্রেয়সী আছে এই সন্দেহ আমারই প্রথম মনে এসেছিল। নইলে কোনো এক জায়গায় মামার বেশিদিন মন বসে না কেন ? ছ'মাস একবছর দু'বছর তিন বছরের জন্যেও এক একবার কোথাও নিখোঁজ হয়ে যায় ? জিগ্যেস করলে বলে, কন্ট্রাক্ট সার্ভিসে ঢুকে মোটা কিছু রোজগার করে এলাম। মিথ্যে বলে না হয়তো, মায়ের মুখে শুনেছি, মামার মতো অভিজ্ঞ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার খুব বেশি নেই, বাবা মারা যাবার পরেও বছর কয়েক ধরে ও-লাইনের যেখানে

যত রকমের ছাপ আর ডিপ্লোমা আছে সব পকেটস্থ করেছে। বিভিন্ন জাহাজ ফ্যাক্টরিতেও বছরের পর বছর কাজ করেছে। তার আধুনিক জাহাজ তৈরির কয়েকটা ছোট বড় প্ল্যানও চড়া দামে বিদেশী জাহাজি কোম্পানিগুলো কিনে নিয়েছে। তাতে যে টাকা মামা পেয়েছে আর চাকরি না করলেও রাজার হালে তার জীবন কেটে যেতে পারে। অথচ মামা দিব্বি কৃপণ, বাজে খরচার বেলায় হাতের ফাঁক দিয়ে পয়সা গলে না। আবার মোটা মাইনের চাকরি নিয়েও কোনো এক জায়গায় বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না। কত বড় বড় কোম্পানির হোমরা-চোমরাদের এজন্যে মামার কাছে এসে ধর্ণা দিতে দেখেছি। মামার তখন হাবাগোবা মুখ। মিটিমিটি হাসে আর মাথা নেড়ে বলে, নাঃ, আমার আর কাজে মন নেই, আপনারা অন্য ব্যবস্থা দেখুন।

কিন্তু মামা কার জন্যে টাকা জমায়, কি জন্যে ঘুরে ফিরে আবার চাকরিতে যায়? চাকরি না করলেও মাঝে মাঝে নিখোঁজ হয় কেন? আমার বদ্ধ ধারণা, মামা কোনো কিছুর সন্ধানে এইভাবে জীবন কাটাচ্ছে। মা-কে জিগ্যেস করতে আরো অবাক লেগেছিল। মা বলেছিল, বলবার হলে সময়ে সে নিজেই তোকে বলবে। বছর তিনেক আগে মামাকেই আচ্ছা করে ধরে পড়েছিলাম। কি ব্যাপার বলতে হবে, কি খোঁজো তুমি? এত বয়স পর্যন্ত বিয়েই বা করলে না কেন?

রঙ্গ মামা রঙ্গ করে দুই চোখ কপালে তুলে ফেলেছিল প্রথম। তারপর, যেন সরম-চাপা লালচে মুখ। তোকে বললে কাউকে বলবি না তো?

কাউকে না, মা-কেও না। কি খুঁজে চলেছ তুমি?

পাত্রী।

আমি হাঁ। পাত্রী! বিয়ে করবে?

বিপন্ন মুখ করে মামা জবাব দিয়েছিল, তোর যে বড় মামীর সাধ। কিন্তু তোর সেই হতে-পারে মামীর খোঁজার একটা ব্যবস্থাও করে

উঠতে পারছি না।

মামাকে মামী আনার তাগিদ আমি চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই দিয়ে আসছি বটে, কিন্তু এমন কোনো ব্যাপার আমার কল্পনাতে আসেনি।

সেই মেয়েকে তুমি দেখেছ কখনো ?

আভাসে দেখেছিলাম, সেই থেকে তার জন্য আমার প্রাণ যায় যায়।

আমি হেসে ফেলেছিলাম। রঙ্গ মামা রসিক চূড়ামণি, বিশ্বাস করব কি করব না ভেবে পাচ্ছিলাম না। আবার মামার এত বছরের হাবভাব দেখে অবিশ্বাস করাও সহজ নয়। কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা না হলে মা-ই বা ও-রকম কথা বলবে কেন ? আবার সত্যি হলে তো মামার মাথা খারাপ বলতে হবে। বলে উঠেছিলাম, তার খোঁজ পেলেই বা কি, এত বছর ধরে কি সেই মেয়ে তোমার জন্য বসে আছে ?

একেবারে স্থির বিশ্বাসে মামা মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, বসে যে আছে সেটা ঠিক জানি, আমি ভিন্ন তার উদ্ধারের আশা নেই, যতদিন এই শরীরটায় শ্বাস-প্রশ্বাস বইবে ততো দিন সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

আমি হতভম্ব, মামা আর সেই হতে-পারে মামী দু'জনারই মাথার গণ্ডগোল কিনা সন্দেহ। জিগ্যেস করেছিলাম, তার সঙ্গে তোমার প্রথম যোগাযোগ কোথায় ?

লিসবনের এক জাহাজে।

কতদিন আগে ?

তা বছর সতের আগে।

মনে মনে একটু হিসেব করে জিগ্যেস করেছিলাম, আমার বাবা তখন বেঁচেছিল ?

মামা মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে, অর্থাৎ ছিল।

বাবা জানতো ?

জানতো কি রে, তোর বাবাই তো আমার সর্বনাশটি করেছে, ওই রূপসীকে এক রকম আমার হাতেই সঁপে দিয়েছিল।

আমি আবার হাঁ। মামা সোজা হয়ে বসে অর্থাৎ যেন এক বিভোর ভাব থেকে আত্মস্থ হয়ে ঠাস করে আমার মাথায় এক রামচাঁটি বসিয়ে দিয়ে বলে উঠেছিল, মামার সঙ্গে যে খুব ফাজলামোর কথা হচ্ছে, অ্যাঁ? ডাকব তোর মা-কে? ভাগ বলছি এখান থেকে।

তিন বছর বাদে আজ এই সংবাদ। মামা সেই নিখোঁজ হতে-পারে মামার হদিস পাওয়ার ব্যবস্থা করেই এসেছে। আর সেই জন্যেই মামার এবার এত বেশি খুশি খুশি বোকা বোকা মুখ। হদিস পেলে মামার কপালে কি আছে কে জানে। সত্যিই কোনো মেয়ে আজ বিশ বছর ধরে কারো জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না। সাগ্রহে জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা মামা, সত্যিই সেই মহিলা ভয়ানক সুন্দরী?

মামা গম্ভীর। ভয়ানক নয়, ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দরী। তার রূপের আভাস পেয়েই আমি বিশ বছর ধরে খতম হয়ে আছি, তাকে স্বচক্ষে দেখলে তুই-ই হয়তো মামার বুকে ছুরি বসাতে আসবি।

কি-যে বাজে ঠাট্টা করো ঠিক নেই।

আচ্ছা, তার বয়েস কত হবে এখন?

তা বছর কুড়ি হবে।

রঙ্গ মামার মাথায় কিছু গণ্ডগোল দেখা দিল কিনা আমার সেই সন্দেহ বাড়ছে। কুড়ি বছর আগে না তুমি তাকে প্রথম দেখেছ বললে?

মামা আমার অজ্ঞতা দেখে বিরক্ত যেন। আমার চোখে সে অনন্ত যৌবনা উর্বশী, তার বয়সের হিসেব দিয়ে কি হবে? তাছাড়া তাকে মুখোমুখি দেখেছি বলিনি তো, বলেছি আভাসে দেখেছি। মোট কথা আমার কাছে তার বয়েস কুড়ি।

মাঝ-বয়সে হতে-পারে মামীর সন্ধান পেয়ে মামার মাথাটা

বিগড়েই গেছে বোধহয়। হেসে টিপ্পনী কাটলাম, কিন্তু তার চোখে তো তোমার বয়েস আটচল্লিশ, পাত্তা দেবে ?

মামা এক ধরনের অদ্ভুত বোকা বোকা মুখ করে চেয়ে রইল আমার দিকে। যেন আমার মুখখানা তার গবেষণার জিনিস। তার মানে বলতে চাস আমি বুড়ো হয়ে গেছি ?

বুড়ো না হোক আধ-বুড়ো তো হয়েছ।

ফোঁস করে রঙ্গ মামা বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে শার্টের ডান হাতের আস্তিন গোটাতে লাগল। শেষে কনুইটা পাঞ্জা ধরার মতো করে টেবিলে রেখে ডাকল, আয় দেখি, একটু খিদে বাড়ানো যাক, দুপুরে আবার দেড় কেজি মাংস সাবড়াতে হবে।

যত মোলায়েম করেই বলুক এটা যে মামার চ্যালেঞ্জ সেটা বুঝতে সময় লাগল না। স্বপ্ন রাজ্য থেকে তাকে মাটিতে টেনে নামানোর জন্য আমিও আমার ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। মামাকে ঘায়েল করতে বড় জোর দু'সেকেণ্ড লাগবে আমার।

কিন্তু হাতে হাত লাগিয়ে পাঞ্জা কষতেই আমি চমকে উঠলাম। মামার মোটা মোটা তুলতুলে আঙুলগুলো যেন চোখের পলকে লোহার আঙুল হয়ে গেল। নির্বিকার মুখে মামা বলল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার এই হাতখানা তুই শুধু টেবিলের ওপর শুইয়ে দে।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? নাকি মামার ছদ্মবেশে কোনো দানব-টানবকে হার মানাতে চেষ্টা করছি। শরীরের মধ্যে রক্ত টগবগ করে ফুটছে, এক হাতে না পেরে শেষে দু'হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে মামার হাতখানা টেবিলে শুইয়ে দিতে চেষ্টা করছি। ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে, কিন্তু মামার হাত দু'আঙুলও নোয়াতে পারিনি। মামা টেবিলে কনুই রেখে নির্বিকার বসে আছে, মুখের এতটুকু বিকার নেই, চোখ দুটো শুধু হাসছে মিটিমিটি, আর আমি যেন সিমেন্টে

গাঁথা এক খণ্ড ইস্পাতকে টেনে নোয়াতে চেষ্টা করছি।

গলদঘর্ম হয়ে হাল ছাড়লাম। বিস্ময়ের অন্ত নেই আমার। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে কি বলতে গিয়ে থমকে গেলাম। পর্দার আড়াল থেকে বোম্বেটে ব্যাটা বিস্ফারিত চোখে নিশ্চয় সব দেখেছে, আর এখন সে মুখ বার করে দিয়ে ডেলা ডেলা চোখ করে মামাকে আর আমাকে দেখছে।

ওর চোখে আমার মতো পালোয়ান বম্বে ছেড়ে তামাম দুনিয়ায় কেউ আছে কিনা সন্দেহ, সেই আমার এই দুর্দশা দেখে অবাক হবে না তো কি?

এই এদিকে আয়।

রঙ্গ মামা আদেশের সুরে ওকে ডাকল। ও কাছে আসতে বলল, তুইও তো মস্ত পালোয়ান, দেখ দেখি হাতটা একটু নেড়ে চেড়ে দিতে পারিস কি না।

বোম্বেটে তাই চাইছিল বোধহয়, যে আমার পরাজয়টা স্বচক্ষে দেখেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। এবার শুরু হল তার ধস্তাধস্তি। তারপর ওরও আমারই মতো দশা এক সময়। হাল ছেড়ে দূরে সরে গিয়ে জিভ বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে রঙ্গ মামাকে যেন নতুন চোখে দেখতে লাগল।

রঙ্গ মামার তেমনি বোকা বোকা খুশি খুশি মুখ। আমার দিকে চেয়ে বলল, এবারে আমি দেখি তোকে ঘায়েল করতে পারি কি না।

অর্থাৎ এবারে আমার কনুই থেকে হাত পর্যন্ত টেবিলের ওপর খুঁটি হয়ে থাকবে এবং মামা সে-হাত টেবিলে শুইয়ে দেবে।

দিল। সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার আমি যুঝতে চেষ্টা করছি। কিন্তু মামার মাত্র পৌনে দু'মিনিট লাগল গোটা হাতখানা টেবিলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে।

সত্যিকারের তারিফের মতো করে রঙ্গ মামা বলে উঠল, তুই তো বড়ো পালোয়ান হয়েছিস দেখিরে, এ-পর্যন্ত এক মিনিটের বেশি কেউ আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। বোম্বেটের দিকে তাকালো,

তোর হাত ব্যাটা আমি আধ মিনিটে টেবিলে গুঁড়িয়ে দেব, চলে আয়—

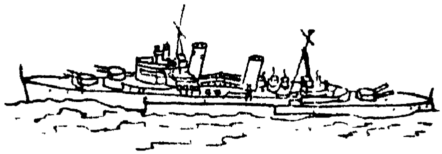
বোম্বেটে ছ'পা এগিয়ে এসেও শেষে ভীত ত্রস্তের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

আমি উঠে এসে আচমকা মামার ছ'পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিলাম। মামা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নিল। হেসে বলল, তোকে কিন্তু আমি ঠাট্টা করিনি, তোর গায়ে সত্যিই বেশ জোর হয়েছে।

রাগত মুখ করে বললাম, ছাই হয়েছে, তুমি আমাকে এ-ভাবে ফাঁকি দিয়েছ ভাবতেও পারি নি। এ-রকম অসম্ভব শক্তি তুমি কি করে পেলে না জানা পর্যন্ত আর তোমাকে ছাড়ছি না।

মামা হাসতে লাগল। এই হাসি মাখা নরম মুখ দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না মানুষটা এমন আসুরিক শক্তি ধরে। জবাব দিল, সব তোর ওই হতে-পারে মামীরই কল্যাণে, তাকে উদ্ধার করব বলে শরীরটাকে একটু তাজা রেখেছি।

কি করে এমন তাজা রাখলে তাই বলো। বিড়ম্বিত মুখ করে রগ্ন মামা বলল, সেটা জানতে হলে তো তোকে আবার একটু কষ্ট করতে হয়, পারলে যে কোনো দিন রাত তিনটের সময় আমার ঘরে একবার আসিস।



যে কোনো দিন নয়, সেই রাতেই তিনটের মিনিট কয়েক আগে আমি রঙ্গ মামার ঘরের দরজার দিকে এগিয়েছি। সমস্ত দিন একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে আমার। এই একটা দিনের মধ্যেই মামার অনেক কথা-বার্তা হাব-ভাব হেঁয়ালির মতো লেগেছে। আর আশ্চর্য, এই বিকেল থেকেই মায়ের মুখখানা কি রকম যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। অথচ মামা এলে মা বেশ খুশি থাকে বরাবর। থেকে থেকে আমার কি রকম মনে হয়েছে, কিছু একটা ঘটার সময় হয়েছে। মামা আমার হতে-পারে মামীর সন্ধানে বেরুবে বলেই কি মায়ের এই মুখ? কেন তাতে কি মামার কোনোরকমে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে?

সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত ধরে পুরনো দিনের অনেক টুকটাক স্মৃতি আর অনেক রকমের চিন্তা আমার মনে এসেছে। ছ'বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। তার পর থেকে বলতে গেলে এক রকম এই মামার তত্ত্বাবধানে আছি। বম্বের এই বাড়িটা মামার, কিন্তু মামা এটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে, তখন চার পাঁচটা ষণ্ডা মার্কা লোক এই বাড়িটা পাহারা দিত, আর আমাকে আগলে থাকত। মামা তখনো হুট হুট করে এখনকার মতোই অনেক দিন বা অনেক বছর পরে পরে এক একবার এসে হাজির হত, কিছুদিন থেকে আবার গা-ঢাকা দিত। কিন্তু সেই বাচ্চা বয়েস থেকেই আমি অনুভব করতে পারতুম। কোনো অদৃশ্য দু'টি চোখের প্রহরা আমার ওপর মোতায়েন আছে। সেই দুটো চোখ এই রঙ্গ মামার।

পড়াশুনায় আমি কোন লাইনে যাব পড়ার বাইরে আমি কি সব অন্য বই পড়ব, এমন কি, কিভাবে শরীরটা তৈরি করব, কি কি অভ্যাস রুটিন মাফিক রপ্ত করব, এই সব যাবতীয় ব্যাপারে মা তার এই ভাইয়ের নির্দেশ মেনে চলেছে। আমি কোনো কিছুতে আপত্তি করলে মা অনমনীয়ভাবে বলে দিত, তোর মামার যখন এই ইচ্ছে তখন এই রকমই হবে।

খুব অল্প বয়সে মামা আমাকে এখানকার মেরিন ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছে ডুবুরীর পোশাক-আশাক পরিয়ে ডীপডাইভিং-এ রপ্ত করেছে। আমার আশি ঘণ্টা জলে সাঁতার কাটার এনডিওরেন্সের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। কিছু দিন বাদে মামার টেলিগ্রাম—কংগ্রাচুলেশনস। আর তার দিন কতক বাদে পার্সেলে মামা আমাকে যে হাতঘড়ি পাঠিয়েছে তার দাম কম করে দু'হাজার টাকা। সেই ঘড়ি পরে জলে সাঁতার কাটাও যায় আর জলের তলায় সময়ও দেখা যায়। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, আমার সমস্ত শিক্ষার মধ্যে আমাকে যেন জলের পোকা বানিয়ে তুলতেই রঞ্জু মামার সব থেকে বেশি আগ্রহ। আরো অবাক কাণ্ড, মায়ের আমি একমাত্র ছেলে, মা যে আমাকে কত ভালবাসে তাও সর্বদাই অনুভব করতে পারি, কিন্তু জেলেদের ডিঙিতে আমি ভয়াবহ সমুদ্রের বহুদূরে চলে গেছি শুনলেও মা আমাকে কখনো বকত না, বা উতলা হত না। বরং মনে হত, মা যেন আমার কাছ থেকে এই রকমই আশা করছে।

আমার ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দেখা গেল, মা বা মামার ইচ্ছে তা নয়। সরাসরি শেষ পর্যন্ত আমাকে বিজ্ঞান পড়ে যেতে হল। এম-এস-সি পাশ করার পর ধরেই নিয়েছিলাম, এবারে আমাকে চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। কিন্তু তার বদলে মামা আমাকে ছোট বড় দু'তিনটে জাহাজে বছর কয়েক ধরে অ্যাপ্রেনটিসগিরি করালে। যেন সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোই আমার কাজ। তারপর এই বছর দেড় দুই ঘরে বসে আছি তাতেও কারো তাপ উত্তাপ নেই। অবশ্য অর্থাভাব বা ভবিষ্যত সংস্থানের ভাবনা আমার নেই। নিজের বাড়ি,

মা চাকরি করে, অঘটনে বাবার মৃত্যুর দরুন বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা মায়ের হাতে এসেছিল, তা ছাড়া মামার অঢেল টাকার ভাগেও আমি পাবই জানা কথা, ভাগ বলছি কারণ, হতে-পারে মামী যদি সত্যিই আসে তাহলে সবটা আর পাব কি করে? এ ছাড়াও আমার বাবার পৈতৃক বিষয় আশয় বিক্রির কয়েক লক্ষ টাকা এখন আমার নামে জমা আছে। এ অবস্থায় কেউ তাগিদ না দিলে কে আর চাকরির দড়ি নাকে পরে? এক বছরে স্বভাবখানাও বাউণ্ডুলে গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে, অতএব চাকরি বাকরি আর কোনোদিন আমার দ্বারা হবে বলে মনে হয় না। কাজের মধ্যে মামা এখানেই থাক আর নিরুদ্দেশ যাত্রাই করুক, মাঝে মাঝে মোটা মোটা বিজ্ঞানের বই কিনে উপহার পাঠায়, সেগুলি আমাকে সব যত্ন করে পড়তে হয়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কাজ, শরীরটাকে বানানো। এই কাজও আমি মন দিয়ে করছিলাম, রক্ত মাংসের শরীরটাকে লোহার শরীর বানিয়ে তুলেছিলাম। আটচল্লিশ বছরের মামার হাতে সেই শরীরের আজ এই হাল। শারীরিক শক্তির সমস্ত গর্ব রঙ্গ মামা আজ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

চোখ থেকে ঘুম উবে গেছে। উন্মুখ হয়ে কতবার যে ঘড়ি দেখেছি ঠিক নেই, কিন্তু রাত তিনটে আর বাজে না। শেষে তিনটে বাজার মিনিট কতক আগেই সন্তর্পণে ঘর ছেড়ে বেরুলাম। নিশুতি রাত, নিঝুম পুরী, মনে হচ্ছিল, একমাত্র আমি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ বুঝি জেগে নেই।

মামার ঘরের কাছাকাছি আসতে পরদার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে মামা জেগেই আছে। পা টিপে এগোচ্ছি, কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছাবার আগেই বিষম চমক। আবছা অন্ধকারে ও-দিক থেকেও তেমনি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে কে।

থমকে দাঁড়ালাম। ও-দিকের আবছা মূর্তিও। পরক্ষণে মনে হল, একমাত্র বোম্বেটে ছাড়া আর কে হতে পারে? দরজার আড়াল থেকে মামার কথা ও ব্যাটাও শুনেছে সন্দেহ নেই। দু'জনেই মামার

কাছে পরাজিত বলে হোক বা যে কারণেই হোক, এই মুহূর্তে ওকে আত্মজন ছাড়া আর কিছু ভাবা গেল না। ঘুম-কাতুরে লোকটা যখন ঘুমের মায়া বিসর্জন দিয়ে রাত দুপুরে উঠেই এসেছে, ওকে বঞ্চিত করি কেন! এগিয়ে গিয়ে ওর ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সামনে টেনে এনে কানে কানে বললাম, টুঁ শব্দ হয় না যেন! আড়াল থেকে দেখবি।

ও ভেবেছিলো ও-ভাবে মাথা টেনে দুটো চড়চাপড় বসিয়ে দেব। খুশিতে আটখানা। অন্ধকারে ওর সাদা দাঁত ঝকমক করে উঠল।

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দরজার দু'দিক থেকে চার আঙুল করে পরদা ফাঁক করে আমরা ঘরের মধ্যে উঁকি দিলাম। খালি গায়ে শুধু জাঙিয়া পরে রঙ্গ মামার যোগ-সাধনা চলছে। যোগ-সাধনা বলব কি যৌগিক ব্যায়াম জানি না। কারণ এ-ধরনের ব্যায়ামের সঙ্গে আমি আদৌ পরিচিত নই। এই সব কসরতের সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বিশেষ যোগ আছে সন্দেহ নেই। রঙ্গ মামার তুলতুলে শরীরখানা এক একবার লোহার মতো কঠিন হয়ে উঠছে, কখনো বা পাথরের মতো নিশ্চল। কখনো বা একখানা হাত অথবা পা সক্রিয় অপর সকল অঙ্গ স্থির, কখনো মাথা আর ঘাড়, কখনো বা শুধু মাথা।

রঙ্গ মামা ওদিকে ফিরে তার যৌগিক সাধনায় মগ্ন। একটা নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে না। প্রায় ভোর পর্যন্ত চলল এই ব্যাপার, তারপর মেঝেতে চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। পরক্ষণে যেন হাত-পা ছড়ানো মৃতদেহ একখানা। এতক্ষণ একটা লোক এ-ভাবে থাকে কি করে, হার্টফেল করল নাকি রে বাবা!

পরক্ষণে আবার চমক। চোখ বোজা অবস্থাতেই রঙ্গ মামার মোটা গলা শোনা গেল, শঙ্কু ঘরে আয় আর বোম্বেটে নিজের ঘরে যা। এখন যদি আবার ঘরের বাইরে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে থাকিস তো তোর মাথাটা সত্যিই টেনে ছিঁড়ব বলে দিলাম।

আমি আর বোম্বেটে দু'জনেই হতভম্ব। একবারও ফিরে না তাকিয়ে বা চোখ না খুলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি জানল কি করে?

আমার না হয় আসার কথা ছিল, কিন্তু বোম্বেটে? রঙ্গ মামার কি মাথার চারদিকে চোখ আছে নাকি?

চোখের ইশারায় বোম্বেটেকে আশ্বাস দিয়ে চলে যেতে বললাম। অর্থাৎ পালা শিগ্‌গির, পরে সব বলব 'খন। তারপর পায়ে পায়ে মামার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সে তখনো চোখ বুজে চিৎপাত হয়ে শুয়ে।

দেখলি? রঙ্গ মামার স্পষ্ট প্রশ্ন।

দেখলাম। কিছুই বুঝলাম না।

চোখ বুজে থেকে মামা হাসল। সেই বোকা বোকা নরম সরম হাসি। বলল, যৌগিক ব্যায়ামই আসল ব্যায়াম, বুঝলি। শরীরটাকে একেবারে ইচ্ছের দাস বানিয়ে ফেলা যায়, স্নায়ুগুলোকেও।

তা কতদিন ধরে তোমার এই কর্ম চলছে?

বছর বিশেক প্রায়, তোর হতে-পারে মামী কি সহজ মেয়েরে বাবা, সেই থেকে নাকে দড়ি পরিয়ে রেখেছে। সময় আর হয় না, এতদিনে হল।

মামা চলে যাবে মনে হলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, এবারে আরো বেশি হল। জিগ্যেস করলাম, তা তুমি মামী জয় করতে যাচ্ছ কবে?

নির্লিপ্ত মামা জবাব দিল, আমার তো শিগ্‌গিরই বেরুবার ইচ্ছে, এখন তুই রেডি হলেই হয়।

আমি লাফিয়ে উঠলাম প্রায়। জোরেই বলে উঠলাম, তার মানে! আমিও তোমার সঙ্গে যাব? আচ্ছা! চোখ খোলো না।

রঙ্গ মামা চোখ মেলে তাকালো। মিটিমিটি হাসছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল। তুই যাবি না তো আমি বুড়ো হাবড়া একা যাব নাকি! তাছাড়া এতদিন তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলাম, পেলে ওই রূপসীকে তোর হাতেই সঁপে দেব।

মামার আবার মাথা বিগড়লো কিনা ঠাওর করতে পারলাম না। বলে উঠলাম, বাজে কথা ছাড়ো, তোমার রূপসীর বয়েস আমার দেড়া হবে, মোট কথা তুমি এবারে আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ?

মামা ভালো মুখ করে মাথা নাড়লো। অর্থাৎ, তাই।

আমি আনন্দে আত্মহারা। তবু বিশ্বাস হয় না যেন। সত্যি বলছ?

দরকার না হলে আমি মিছে কথা বলি না।

মা জানে?

আবারও মাথা নাড়ল। জানে।

এই জন্যেই মায়ের মুখ সমস্ত দিন ধরে গম্ভীর তাহলে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে ছেড়ে দিতে মা আপত্তি করবে না?

নিজের নগ্ন ভুঁড়িটাকে সস্নেহে পর্যবেক্ষণ করতে করতে মামা জবাব দিল, তুই একটা গবেট, এতদিনে নিজের মাকেও চিনলি না!

নিশ্চিন্ত হয়ে মামার মুখোমুখি জাঁকিয়ে বসতে যেতেই বাধা পড়ল। উঁ-হুঁ-হুঁ দরজাটা বন্ধ করে আয়, চা দেবার নাম করে বোম্বেটে ব্যাটার ঘরে ঢোকার চান্স আছে।

আমি দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সত্যিই তাজ্জব। পেয়ালা-পট সমেত চায়ের ট্রে হাতে বোম্বেটে এদিকেই আসছে। রঙ্গ মামা কি মানুষ আমি ভেবে পাই না। বোম্বেটের হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে ভ্রুকুটি করে চাপা গলায় বললাম, পালা, প্রাণে বাঁচতে চাস তো এখন আর ধারে কাছে আসবি না।

মামার সামনে ঠক করে ট্রে-টা নামিয়ে সে বিগলিত বদনে হাসতে লাগল। আমি ছদ্ম কোপে জিগ্যেস করলাম, তোমার মাথায় এতও থাকে কি করে?

পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে মামা জবাব দিল, এর পিছনেও একটু বিজ্ঞানের কারিকুরি আছে।

কি বিজ্ঞান?

তার নাম সাধারণ বুদ্ধি, যাকে বলে কমন-সেন্স। এ যত খাটাবি, দেখবি অনেক ব্যাপারের ছায়া যেন আয়নায় দেখার মতো করে চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

অস্বীকার করা গেল না, কারণ মামা নিজেই এর জ্যান্ত প্রমাণ। নিজের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে কাজের কথায় এগোলাম। এইবার

সেই রূপসীর খবর বলো, এখন কোথায় আছে বলে তোমার ধারণা?

নিবিষ্ট চিত্তে কয়েক চুমুক চা জঠরে চালান দিয়ে জবাব দিল, লিসবন আর স্যানটোস-এর মাঝামাঝি কোথাও।

যেন দাদার আর সান্তাক্রুজের মাঝামাঝি কোথাও। স্যানটোস নামটা নতুন শুনলাম, প্রথমটা অর্থাৎ লিসবন নামটা ভোলবার নয়। এই জন্যেই মামা এত ঘন ঘন লিসবন যায় বোঝা গেল।

জিগ্যেস করলাম, লিসবন থেকে স্যানটোস কতটা পথ?

প্রায় পাঁচ হাজার মাইল, ঠিক ঠিক বলতে গেলে চার হাজার ন'শ পঞ্চাশ মাইল।

ও বাবা! মাঝে কি?

মাঝে দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক মহাসাগর। শুনেই ভিতরটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করছি। এর মাঝে কোথায় সে আছে, কোনো দ্বীপে নিশ্চয়?

না সমুদ্রের নীচে।

বিস্ময়ে দিশেহারা অবস্থা আমার। হাঁ করে খানিক চেয়ে থেকে জোরেই তাড়া দিলাম, খুলে বলবে সব, নাকি আমাকে শুধু বোকাই বানাবে?

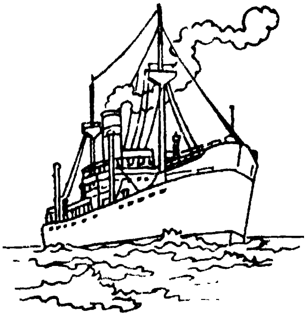
বলছি। মামা একটু গম্ভীর, যে অভিসারে চলেছি আমরা তার একটা ছক তোর মগজে সর্বদা থাকা দরকার। এর জন্য আজ বিশ বছর হয়ে গেল আমি নিজেকে তৈরি করছি, তোকেও তৈরি করছি। এটা সফল হলে তোর বাবার মুক্তি, আমার মুক্তি, তোর আর তোর মায়েরও মুক্তি।⋯একটা কথা, এ-মুক্তির জন্য পা বাড়ানোর পর থেকে আর একটা বিদ্যে তোকে রপ্ত করতে হবে, সেটা হল দু' ঠোঁট সেলাই করে রাখার বিদ্যে।

সবগুলো স্নায়ুতে যেন উত্তেজনার আগুন লেগেছে। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। হঠাৎ মনে হল, আমরা আদৌ নিরাপদ যাত্রায় পা বাড়াচ্ছি না। মুখ সেলাই করে রাখার এ অনুশাসন আজ নতুন

নয়। আমার ছয় থেকে দশ বারো বছর বয়েস পর্যন্ত জনা-কতক যণ্ডামার্কা লোক আমাকে ঘিরে থাকত আগেই বলেছি। তখন তারা আমাকে কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথাও কইতে দিত না। ওই বয়সের পর থেকে আমি যাকে বলে দস্তুর মতো দামাল ছেলে হয়ে উঠেছিলাম। যারা আমাকে ঘিরে থাকত তারা যে ওই কাজের জন্য মাস গেলে মায়ের কাছ থেকে টাকা পায় তাও বুঝে ফেলেছিলাম। কাজেই ওদের আমি পরোয়া করতাম না, বরং ওদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায়ই এ-দিক সেদিক চলে যেতাম। আমাকে আগলে রাখার চেষ্টা নিষ্ফল বুঝে মা খুব সম্ভব মামার পরামর্শ মতোই একে একে ওদের বিদায় করেছিল। মনে পড়ে. সে-সময় হঠাৎ এক-একটা অচেনা বিদেশী লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-সালাপ হয়ে যেত। আর তারা বেশির ভাগই মামার কথা জিজ্ঞাসা করত। অনেক রকমের কথা, অনেক রকমের খোঁজ-খবর। সে-সব মা-কে জানাতে অদ্ভুত কঠিন মুখ করে মা আমাকে বলেছিল, খবরদার, মামার সম্পর্কে একটি কথাও কোনো দিন কাউকে বলবি না। শুধু বলবি, কৃচিত কখনো এখানে আসে, দিনকতক থেকে আবার চলে যায়। কোথায় যায় বা কি করে আমরা কিছুই জানি না।

সেই কিশোর বয়েস থেকে মামাকে ঘিরে একটা রহস্য আমার মনের তলায় থেকেই গেছল। আজ সে সব আমার সামনে ভিড় করে আসছে। মনে হচ্ছে আমার শিক্ষা দীক্ষা, আমার স্বভাব, আমার শক্তি-সামর্থ সব কিছু যেন মা আর মামা একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে গঠন করেছে।

এখন আমি ঠিক বুঝছি, মায়ের মনের তলায় যে চাপা দুঃখ জমাট বেঁধে আছে সে শুধু বাবার অকাল মৃত্যুর জন্যেই নয়। সে ছাড়াও এমন আরো কিছু আছে যার ফয়সালা হলে মায়ের বেদনার বোঝা অনেকটা হালকা হবে। আর তাই যদি হয়, তো মায়ের সঙ্গে আমি সমুদ্রের তলায় ছেড়ে রসাতলেও যেতে রাজি আছি।



বিশ বছর আগের যে-চিত্রটি রঙ্গ মামা আমার চোখের সামনে তুলে ধরল সেটা যেমন রোমাঞ্চক তেমনি নিদারুণ। শুনতে শুনতে আগুনের মতো একটা গলিত উত্তেজনার স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে মাথার দিকে উঠছিল।

দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দু'বছর আগে থেকে আমার বাবা বিনায়ক তরফদার ছিল লিসবনের 'স্টীম-লাইন' কারগো সিপের খোদ ক্যাপ্টেন। বিশ হাজার টনের প্রকাণ্ড মালবাহী জাহাজ। শেষ বার যখন বাবা 'স্টীম-লাইন' নিয়ে অ্যাটলান্টিক পাড়ি দেয়, মাত্র আটত্রিশ বছর বয়েস তার তখন। ওই বয়েসেই কাজে বাবার এত সুনাম যে অনেক বড় বড় জাহাজ কোম্পানি মোটা টাকার বিনিময়ে বাবাকে ভাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। এক কথায় বাবা তখন প্রচণ্ড দাপটের ক্যাপ্টেন আমার পাঁচ বছর বয়েস পর্যন্ত আমি আর মা বাবার সঙ্গে জাহাজে কাটিয়েছি। এর পর আমার পড়াশুনার তাগিদে মা আমাকে নিয়ে বম্বেতে বসবাস শুরু করেছিল। ঠিক ছিল, বছরের তিন মাস ছুটিতে বাবা এসে আমাদের কাছে থাকবে, আর মায়ের বা আমার লম্বা ছুটি ছাটায় আমরা বাবার সঙ্গে তার জাহাজে বেড়াব।

রঙ্গ মামা সেই বছরেই 'স্টীম-লাইন' জাহাজে সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নিয়েছে। নাম করা ভালো ছাত্র ছিল মামা। আমার দোর্দণ্ড প্রতাপ বাবার নিজের কাছে তাকে টেনে নিতে একটুও অসুবিধে হয়নি। বাবা বেঁচে থাকলে রঙ্গ মামাও আরো কত

উঁচুতে উঠত ঠিক নেই। আমার বাবা তার মায়ের একটি মাত্র সন্তান, তাই রঙ্গ মামা ছিল তার প্রাণের অধিক ছোট ভাইয়ের মতো আর রঙ্গ মামাও বাবাকে যতো শ্রদ্ধা করত তেমন আর দুনিয়ার কাউকে করত না।

লিসবন থেকে 'স্টীম-লাইন' ছেড়ে যাবার ঠিক আগের রাত্রে মামা দেখে, কি-রকম যেন অস্বাভাবিক থমথমে মুখ বাবার। মামা অবাক, বিকেলেও বাবা দিব্বি খোশ মেজাজে ছিল। সন্ধ্যায় ডক্টর জোহান তাকে বিদায়ী পার্টি দিয়েছে। নামজাদা বিজনেস ম্যাগনেট ডক্টর জোহান, সে বছরেই লিসবনে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। অতি অমায়িক অথচ দিলদরিয়া লোক, বাবার সঙ্গে কি করে যেন তার বেশ খাতির হয়ে গেছল। মামার ধারণা, ওই জাহাজে স্যানটোসে তার কিছু মাল যাচ্ছে, যতদূর শোনা গেছে ব্রেজিল-এ তার ব্যবসার শাখা আছে।

ডক্টর জোহানের পার্টি থেকে ফিরে আসার পর থেকেই বাবার ওই মুখ। সেই মুখ কখনো বিবর্ণ, কখনো বা টকটকে লাল। আর ভয়ানক অস্থির। কি হয়েছে দু'তিন বার জিগ্যেস করতে বাবা হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল মামাকে, বলল, যদি কিছু বলার থাকে আমি নিজেই বলব, ফের আমাকে উত্যক্ত করলে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেব।

রঙ্গ মামা হতভম্ব, এমন কটু কথাও বাবা তাকে বলতে পারে এ যেন অবিশ্বাস্য!

রাত প্রায় দেড়টার সময় কেবিনের দরজায় টকটক আওয়াজ হতে মামা ধড়মড় করে উঠে এসে দেখে দরজায় বাবা দাঁড়িয়ে। তেমনি রক্তশূন্য অথচ থমথমে মুখ। বিড়বিড় করে বাবা বলল, তখন মাথার ঠিক ছিল না, কিছু মনে কোরো না।

মামা মাথা নাড়ল, কিছু মনে করেনি। সেই একই প্রশ্ন করল, কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো দাদাজী, তোমার এই মুখ দেখে আমার যে ভয়ানক খারাপ লাগছে।

মামা বাবাকে দাদাজী বলে ডাকত। বাবা ঠোঁটে আঙুল

ঠেকিয়ে জবাব দিল, পরে বলব, সাংঘাতিক কিছুই হয়েছে কিন্তু এখন কোনো কথা নয়। এক্ষুণি জনাকতক লোক কিছু মাল নিয়ে আসবে, অফিসারদের মধ্যে একমাত্র তুমি আর আমি শুধু জাহাজে আছি। যে দুই একজন খালাসী আছে তারা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে আছে। তোমার কেবিনের খোলা জানলা দিয়ে কে আসছে যাচ্ছে দেখা যায়, অপরিচিত লোক দেখে তুমি যেন কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এসো না বা কোনো রকম চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ কোরো না। কেবিনে বসে ওদের শুধু ভালো করে লক্ষ্য করবে, ওরা আট জন আসবে, তার মধ্যে ছ'জন ফিরে যাবে, আর দু'জন আমাদের সঙ্গে স্যানটোস যাবে।

ক্যাপ্টেনের বা কর্তৃপক্ষের বিশেষ পারমিশন থাকলে মালবাহী জাহাজেও দু'-পাঁচ জন যাত্রী যেতে পারে। মামা কোনো রকম প্রশ্ন না করে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। ওই মুখে যেন একটা অব্যক্ত চাপা যন্ত্রণা ছেয়ে আছে।

বাবা আবার বলল, আর একটা কথা, যে দু'জন লোক আমাদের সঙ্গে স্যানটোস পর্যন্ত যাবে, তারা যেন তোমার আমার সম্পর্কটা না বুঝতে পারে। দু-একজন অফিসার জানে তাদের মুখে শুনবে কিনা বলতে পারি না অবশ্য, কিন্তু সহজে টের না পাওয়াই ভালো। শুধু দূর থেকে ওদের ওপর লক্ষ্য রাখবে, বিশেষ করে জাহাজ যে দিন পোর্টে ভিড়বে তার আগের দু'রাত্রিতে।

রঙ্গ মামার ভিতরটা উদ্বেগে ছেয়ে গেল। কারণ, বাবা দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষ, তার যখন এই মানসিক অবস্থা, সাংঘাতিক কিছুই ঘটতে যাচ্ছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু একটি কথাও জিগ্যেস করার ফুরসৎ মিলল না। জানলা দিয়ে মামা দেখল, ডকের গেটে সেনট্রিদের কাগজ দেখিয়ে কতগুলো লোক জেটি ধরে জাহাজের দিকে আসছে। কেবিনের আলো নেভানো, আর ও দিকটায় দিনের মতো আলো। অতএব যারা আসছে রঙ্গ মামা তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ওদের কিছু

দেখার সম্ভাবনা নেই।

ঘাড় ফিরিয়েই মামা টের পেল কেবিনে সে একলা দাঁড়িয়ে, বাবা নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশে গেছে।

রঙ্গ মামা তার জানলা থেকে হাত দুই দূরে এসে দাঁড়াল। আটজন নয়, ন'টি লোককে জেটি ধরে এগিয়ে আসতে দেখল। তাদের আট জনের হাতে মাঝারি স্যুটকেসের আকারের আটটা হাতলঅলা বাক্স। হ্যাণ্ডেল ধরে স্যুটকেসের মতো করেই ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে বটে, কিন্তু বাক্সগুলো যে দস্তুর মতো ভারি সেটা বাহকদের চলা দেখেই বোঝা যায়। তাদের পিছনে একটা লোক চুরুট টানতে টানতে আসছে। মামার মনে হল ওই বাড়তি লোকটা তদারকে এসেছে।

মামা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল সকলকে। লোকগুলোর মূর্তি আদৌ ভয়াবহ নয়। নিরীহ গোছের ভদ্র চেহারা সকলের, বাবা এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে চুরুটধারী লোকটার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। আর সেই লোকটাও অন্তরঙ্গ খুশি মুখেই বাবার একখানা হাত ধরে ঝাঁকালো।

সকলকে নিয়ে বাবা ভিতরে চলে এলো। কেবিন থেকে আর কিছু দেখার জো নেই। কিন্তু রঙ্গ মামা ভিতরেও বসে থাকতে পারছে না। বাবার জন্যেই ভিতরটা তারও অস্থির। পায়ে পায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। পাছে শব্দ হয় সেই ভয়ে জুতোও পরে নি। একটা শেডের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, বাবা ওই চুরুটধারী আর বাক্সওয়ালা লোকগুলোকে জাহাজের স্ট্রংরুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নিরীহমুখো লোকগুলো চারদিক ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে এগোচ্ছে। জাহাজটা খাঁ-খাঁ করছে দেখে তারা পরিতুষ্ট বোধহয়।

খানিকক্ষণের মধ্যেই সকলে ফিরল। এবার সকলেরই ওদের করো মুখে চুরুট কারো মুখে সিগারেট। বাবা কথা-বার্তা কইতে কইতে ওদের জেটির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মামা আবার কেবিনের জানলা দিয়ে দেখল ন'টা লোকই চলে

গেল। ক্লান্ত শ্রান্ত পায়ে বাবা একা ফিরছে।

রঙ্গ মামা প্রতীক্ষায় ছিল, বাবা নিঃশব্দে তার ঘরেই ঢুকল। আবছা অন্ধকারেও মামার মনে হল বাবার এমন অবসন্ন মূর্তি আর বুঝি দেখেনি। রঙ্গ মামা তাড়াতাড়ি কেবিনের দরজা জানলা বন্ধ করে আলো জ্বালল। বাবা তার বিছানার ওপর বসে পড়ল।

মামা তাগিদের সুরে বলে উঠল, কি ব্যাপার সব খুলে বলো দাদাজী, এরা চোরাই মাল চালান করছে?

বাবা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই।

কি জিনিস?

সোনা।

অত সোনা?

হীরেও আছে কিছু। সব মিলিয়ে প্রায় ষোল-সতের কোটি টাকার জিনিস যাচ্ছে স্যানটোসে, সেখান থেকে আবার নানা জায়গায় চালান যাবে। স্যানটোস পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই আমার দায়িত্ব শেষ!

এ দায়িত্ব তোমাকে নিতে হল?

জবাবে থমথমে মুখে বাবা শুধু তাকালো মামার দিকে।

মুহূর্তের জন্য মামার মেজাজ বিগড়ে গেছল। চাপা ঝাঁঝে জিগ্যেস করেছিল, মাল নিরাপদে পৌঁছে দিলে তোমার সম্পর্কে ওরা কি বিবেচনা করবে বলেছে?

বলেছে জীবনে আর আমাকে কোনো মেহনতের কাজ করতে হবে না, সে রকম ব্যবস্থা তারা করে দেবে!

অর্থাৎ রাজা-উজীর বানিয়ে দেবে। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে মামার সাময়িক ক্ষোভ উবে গেল। না, বাবা কোনোরকম লোভের বশবর্তী হতে পারে না, এটা তার স্থির বিশ্বাস। তবু মামা অসহিষ্ণু স্বরেই বলে উঠল, কিন্তু তুমি রাজী হলে কেন দাদাজী, প্রাণের ভয়ে?

বাবার মুখে বেদনার্ত ছায়া। জবাব দিল হ্যাঁ···কিন্তু সেটা নিজের প্রাণের ভয়ে নয়।

এরপর বাবা আস্তে আস্তে যা জানালো তার সারমর্ম, ডক্টর জোহান এক ভয়াবহ আন্তর্জাতিক অবৈধ চক্রের বিশিষ্ট কর্মী। সমস্ত পৃথিবীতে তাদের জাল বিছানে। বহু কোটিপতি অভিজাত আর প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে এর পিছনো। দরকার হলে মানুষকে এরা পিঁপড়ের মতো মেরে ফেলতে পারে। আর সভ্য সমাজে এদের এত প্রতিপত্তি যে দিনকে রাত করে ফেলতে সময় লাগে না। ডক্টর জোহান সম্পর্কে বাবার কখনো এতটুকু সন্দেহ হয়নি, যদিও তার জানা ছিল লিসবন আর ব্রেজিলের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক র‍্যাকেট সংস্থা ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠছে। আচারে-ব্যবহারে ডক্টর জোহান লোকটা যেমন অমায়িক তেমনি উদার আর সুরসিক। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে একটা লোক অতবড় বিজনেস ম্যাগনেট হয়ে উঠেছে ভেবে বাবা মনে মনে তাকে শ্রদ্ধাই করত। তাই নিঃসঙ্কোচে বিকেলে তার পার্টিতে যোগ দিতে গেছল, বিশেষ করে অনেক দিনের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছে বলে বাবার সম্মানেই যখন এই পার্টি।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বাবা দেখে পার্টিতে জনা বারো মাত্র লোক। ডক্টর জোহান আর বাকি সকলে বাবাকে খুব সাদর আপ্যায়ন জানালো, অনেক খাওয়ালে দাওয়ালে। তারপর ডক্টর জোহান খুব মোলায়েম স্বরে প্রস্তাব করল, আমাদের সামান্য একটু উপকার করতে হবে হে ক্যাপ্টেন তরফদার, কিছু মাল স্যানটোসে পৌঁছে দিতে হবে।

বাবা মনে মনে একটু অবাক হলেও সাদা-সিধে জবাব দিলে, বেশ তো, বুক করে নিন, জাহাজে এখনো জায়গা আছে, আমি নিজে আপনার মালের তদারক করব'খন।

ডক্টর জোহান হাসি মুখে মাথা নাড়ল, তদারক তো আপনি নিশ্চয় করবেন, কিন্তু মাল বুক করার একটু অসুবিধে আছে, তাছাড়া মালের সঙ্গে দুটি ভদ্র-লোকও যাবে আপনার জাহাজে, আপনাকে সেই ব্যবস্থাও অনুগ্রহ করে করে দিতে হবে।

শোনামাত্র বাবার সব ক'টা স্নায়ু একসঙ্গে ঝাঁকুনি খেল বুঝি। সকলের দিকে তাকালো, জোড়া জোড়া চোখ যেন তার দিকে চেয়ে টিপ টিপ হাসছে। বিপদ সম্পর্কে বাবার সচেতন হতে সময় লাগল না একটুও, তবু বেশ ভদ্রসুরেই জিগ্যেস করল, কি মাল আপনাদের?

ডক্টর জোহান জবাব দিল, খুব বেশি কিছু নয়, কয়েক পেটি সোনা আর কিছু হীরে। যোল-সতের কোটি টাকার মতো দাম হবে …স্যানটোসে মালগুলো আপনি নিরাপদে বার করে দিলেই আপনার দায়িত্ব শেষ, আর এইটুকু সাহায্যের বিনিময়ে আপনি যা পাবেন সেটা চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত হওয়ার ব্যাপার।

ডক্টর জোহানের চোখে চোখ রেখে বাবা স্থির চেয়ে রইল খানিক। মিটি মিটি হেসে ডক্টর জোহান বলল, কি আশ্চর্য, এই সামান্য প্রস্তাবটা শুনেই আপনি ঘাবড়ে গেলেন নাকি?

বাবা মাথা নাড়ল। জবাব দিল, সে-রকম ঘাবড়াবার মানুষ আমি নই, ওই সামান্য সাহায্যটুকু যদি আমি না করি তাহলে কি হবে সেটাও ব্যক্ত করে ফেলুন।

ডক্টর জোহান জবাব দিল, তাহলে তো আপনার পক্ষে একটু মুশকিল হবে, 'স্ট্রীম-লাইন' আবার কবে কোন ক্যাপ্টেনের তত্ত্বাবধানে যাত্রা করবে আপনার কোম্পানিকে হয়তো সেই ভাবনা ভাবতে হবে।

বাবাও তেমনি অমায়িক ব্যঙ্গ স্বরে জবাব দিল, আমাদের জাতটাকে তোমার ঠিক জানা নেই জোহান, তুমি আমাকে মৃত্যু-ভয় দেখাচ্ছ, আমি তোমাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করলাম, তোমাদের কাজ তোমরা করতে পারো! এ কথার পরেই শেষ চেষ্টার মতো বাবা ছোট একটা চাল দিল। বলল, কিন্তু কোনো কারণে তোমার ওই মিষ্টি মুখখানা দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল, তাই কোথায় আমি নেমন্তন্ন খেতে এসেছি আমার এখানকার অন্তরঙ্গ দু-একজন জানে—

বাবার মুখের দিকে চেয়ে ডক্টর জোহান নিঃশব্দে হাসতে লাগল। অপর সকলেও। যেন ভারী মজার কথা শুনল তারা। ডক্টর জোহান বলল, ক্যাপ্টেন তরফদার তুমি বীরও বটে চালাকও বটে। কিন্তু ভাঁওতার দরকার কি, ওই তো টেলিফোন রয়েছে তোমার হাতের কাছে, তুমি এখানকার শেরিফ থেকে শুরু করে যাকে খুশি ডাকো না, কথা দিচ্ছি আমরা তাদের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকব, তোমার সততা পরখ করার জন্যে আমরা এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম শুনলে তারাও আমাদের সঙ্গে হেসে গড়ায় কি না দেখো—

এদের সঙ্গে ভাঁওতাবাজী করে লাভ নেই বাবা বুঝে নিয়েছে। টেবিলের তলা দিয়ে একটা হাত পকেটের রিভলভারটা টেনে বার করতে যাচ্ছিল, মৃত্যুর আগে ওই জোহানটাকে অন্তত যদি খতম করে যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই জোহানসহ সব ক'টা লোক আবার হেসে উঠল। ওদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে রিভলভার।

হাসতে হাসতে জোহান বলল, তোমার বীরত্ব আর সাহস দেখে সত্যি মুগ্ধ হচ্ছি ক্যাপ্টেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, তুমি অপারেশন জিরো সভ্যদের সঙ্গে কারবারে নেমেছ, সকলের সব চেষ্টা শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে জানে বলেই সংস্থার ওই নাম, তোমার ও হাতখানা পকেটে ঢোকার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে, মিথ্যে ও বেচারাকে কষ্ট দেবে কেন ?

হাতটা বাবা আবার আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর রাখল। অপারেশন জিরো নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়েছে কাদের খপ্পরে পড়েছে। একমাত্র ভগবান সহায় না হলে এই চক্র থেকে উদ্ধারের আশা নেই। কিন্তু তা বলে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার মানুষও বাবা নয়। সমান তেজে বলে উঠল, তাহলে তোমাদের অন্য ক্যাপ্টেনের জন্যেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে, ওই রিভলভার দিয়ে তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করতে পারো।

ডক্টর জোহান তেমনি মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল। বলল,

তোমাকে সসম্মানে এখানে ডেকে এনেছি এরকম একটা জঘন্য কাজ করব বলে, ছি ছি ছি, কি-যে ভাবো তুমি আমাদের! তুমি অনায়াসে উঠে চলে যেতে পারো, কেউ তোমার গায়ে আঁচড়টিও কাটবে না। তবে পরে তোমার হয়তো একটু অনুতাপ হবে। আচ্ছা, এই মহিলাটিকে তুমি হয়তো ভালই চেনো……

পকেট থেকে পুরু বড় খাম বার করে তার ভিতর থেকে একটা ছবি বাবার সামনে টেবিলের ওপর রাখল ডক্টর জোহান।

বাবা চমকে উঠল একটু। আমার মা লীলা তরফদারের ফোটো। হাসি মুখে মা যেন বাবার দিকেই শুধু চেয়ে আছে। দুর্জয় রাগে বাবা ডক্টর জোহানকে বলল, আমি চিনি, কিন্তু তোমরা চেনো না। জেনে রেখো সত্যের খাতিরে এই মহিলাও মরতে ডরায় না।

ডক্টর জোহান যেন গুণমুগ্ধের মতোই মাথা নাড়ল। তারপর খাম থেকে আর একটা ফোটো বাবার সামনে ফেলে বলল, একেও চেনো নিশ্চয়, আ-হা হোয়াট এ লাভলি ডার্লিং।

এই বারে বাবার বুকের তলায় দুঃসহ মোচড় পড়ল একটা। তার সামনে আমার ছ'বছর বয়সের ছবি। বম্বের বিচ-এ আমি খেলা করছি।

স্তব্ধ নেত্রে বাবা মুখ তুলে ডক্টর জোহানের দিকে তাকালো। গলার স্বর আরো নরম করে জোহান বলল, দেখো, কেউ অবাধ্য হলে আমাদের অপারেশন জিরোর কাজকর্মের ধারা একটু ভিন্ন। এমন ফুটফুটে ছেলেটা প্রথমে তার হাত-পায়ের আঙুলগুলো খোয়াবে, পার্সেলে সেগুলোর কিছু যাবে তোমার স্ত্রীর কাছে আর কিছু তোমার কাছে, সেই সঙ্গে তোমার স্ত্রী জানবে তোমার অবাধ্যতার দরুনই ছেলের এই শাস্তি। তারপর তার হাত-পায়ের টুকরোগুলোও পৌঁছবে তোমাদের কাছে, কিন্তু ছেলেটা তখনো সজ্ঞানে বেঁচে থাকবে, এই বিজ্ঞান যুগে প্রাণটুকু জিইয়ে রাখার আশ্চর্য কৌশলও আমাদের জানা আছে। এই প্রোগ্রাম নির্বিঘ্নে পালন করার পর তোমার স্ত্রীর দিকে আমরা নজর দেব, সব শেষে তোমার দিকে।

ক্যাপ্টেন তরফদার, সামনে ঝুঁকে খুব মোলায়েম সুরে জোহান বলল, সাহস আর সততার মোহে পড়ে এতবড় বিপদ ডেকে এনো না, আমাদের কথার নড়চড় হয় না, অবাধ্য হলে ছনিয়ার কোনো শক্তি আমাদের হাত থেকে তোমার ছেলে বউকে রক্ষা করতে পারবে না।

না, নিজের জন্যে নয়, মায়ের জন্তেও নয়, শুধু আমার জন্যেই বাবা দিশেহারা হয়ে পড়ল। জোহান সুবর্ণ মুহূর্তটি বেছে নিয়ে বলল, ক্যাপ্টেন তরফদার তোমার সিদ্ধান্ত জানার জন্য ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে, রাজি না হলে ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে ইণ্ডিয়ায় আমাদের অপারেশনের নির্দেশ চলে যাবে, তারপর তোমার মত বদলালেও আমার আর কিছু করার থাকবে না।

পাঁচ মিনিটের আগেই বাবা তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। ওরা সব থেকে ছুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে, সেই ছুর্বল জায়গা আমি। এই ছাব্বিশ বছর বয়সেও ছ'বছরের ছেলের মতো আমার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছিল। বাবা, তুমি আমাকে আর একটু কম ভালো-বাসলে না কেন, এই অযোগ্য ছেলের জন্য কেন এতবড় অন্যায় নিজের ঘাড়ে নিলে?

পরদিন ঠিক ঘড়ি-ধরা সময়ে 'স্ট্রীম-লাইন' নিয়ে বাবা দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক পাড়ি দেবার উদ্যোগ করেছে। লিসবন থেকে স্যানটোস, মাঝে চার হাজার ন'শ পঞ্চাশ মাইল জল-পথ। মাঝে মাঝে কতগুলো বন্দরে মাল তোলা আর নামানো আছে। যাত্রা শুভ হলে আর ঠিক হিসেব-মতো জাহাজ চললে তিন সপ্তাহের প্রোগ্রাম। তারও চার সপ্তাহ বাদে স্যানটোস থেকে প্রত্যাবর্তনের তারিখ।

কিন্তু শুরুতেই রঙ্গ মামার মনে হয়েছে, যাত্রা শুভ হয়নি, আর শেষ পর্যন্ত শুভ হবেও না। থেকে থেকে কেবলই তার মনে হয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। বাবার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে এই ভয়টা তার আরো বদ্ধমূল হয়েছে। শুধু বাবা কেন, বাবার

হাবভাব আচরণ দেখে জাহাজের অনেক পদস্থ কর্মীরাও অবাক হয়েছে। চুপি চুপি অনেকবার তারা মামাকে জিগ্যেস করেছে, ক্যাপ্টেনের কি হল হঠাৎ! বাবা হাসে না, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কারো কাজের এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তার বজ্র হুংকারে মেটদের বুকের তলায় কাঁপুনি ধরে। বাবার এমন মূর্তি যে রঙ্গ মামা পর্যন্ত সাহস করে তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

ক্যাপ্টেনের স্পেশ্যাল পরোয়ানা নিয়ে অপারেশন জিরোর যে দু'জন লোক জাহাজে চলেছে তারা কিন্তু বেশ অমায়িক আর হাসি-খুশি খোশমেজাজের লোক। দেখলে বা কথা বলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে অমন একটা মারাত্মক চক্রের সঙ্গে তারা জড়িয়ে আছে। ওদের একজনের নাম সলোমন আর একজনের নাম গোনডা। দু'জনের ওপরেই জাহাজের মেটরা খুশি খুব। সর্বদা ফুর্তির কথা বলে আর দেদার মদ খাওয়ায় মেটদের। তারা খুশি থাকবে না কেন!

ওদের দু'জনের সামনে রঙ্গ মামাও মোটামুটি গম্ভীর মানুষ। উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী হিসেবে সামনাসামনি দেখা হলেই ওরা মামাকে শশব্যস্তে সেলাম ঠোকে। ওদের কপট বিনয় রঙ্গ মামা ধরতে পারে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করে না।

দিন চারেক বাদে গভীর রাতে রঙ্গ মামার কেবিনের দরজায় টোকা পড়ল। এ ক'দিনের মধ্যে একটা রাতও মামার ভালো ঘুম হয়নি। সর্বদা একটা দুশ্চিন্তায় ভিতরটা ছেয়ে থাকত। সেই রাতেও মামা তখন পর্যন্ত জেগেই ছিল। দরজা খুলে দিতে বাবা ঘরে ঢুকল। মাথার টুপিটা কপাল পর্যন্ত টানা, গায়ে একটা কালো আলখাল্লা জড়ানো, হঠাৎ দেখলে কেউ চিনতে পারবে না লোকটা কে।

গা থেকে সেগুলো খুলে বাবা মামার বিছানায় বসল। এই ক'দিন মামার মনে হয়েছে সর্বদা একটা চাপা রাগে আর ক্ষোভে বাবা যেন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে চলেছে। এখন আরো ভয়াবহ মুখ।

বাবা বলল, তুমি যে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সলোমন আর গোনডা সেটা টের পেয়েছে। এ-খবরটা আমি ওদের দলের সর্দারের কাছে গোপন করে ভালো করিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাও জানিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে, এই ক'দিনে আমার চাল-চলন আর ব্যবহার দেখে জাহাজের সমস্ত কর্মচারীরাই নাকি অবাক বেশ, অতএব তারা উপদেশ দিয়েছে, সকলের ভালোর জন্যেই আমার আচরণ খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হওয়া উচিত। ওরা নিজেরাই জানিয়েছে, এই জাহাজের প্রতিদিনের আর প্রতি ঘণ্টার খবর ওদের দলের মানুষেরা জানতে পারছে।

অর্থাৎ ওদের সঙ্গে ছোট ট্র্যানসমিটার আছে, জাহাজের খবরা-খবর ওরাই নিয়মিত দলের কাছে পাঠাচ্ছে। আর দলের নির্দেশ মতোই আমার বাবাকে একটু সমঝে দিয়েছে।

মামার ইচ্ছে করছিল, তক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে ওদের মুণ্ডু দুটো ধড় থেকে ছিঁড়ে আনতে। কিন্তু তাতে সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হবে না, উল্টে বিপদের রাস্তা আরো প্রশস্ত হবে।

কিন্তু বাবা এরপর যে-কথা বলল, শুনে মামা স্তব্ধ। বাবা বলল, আমার বদ্ধ ধারণা, ওদের কাজ হাসিল করে দিলেই ওরা আমাকে রেহাই দেবে না। ওদের গুপ্ত কথা জানে এমন কোনো বাইরের লোককে ওরা জীবিত থাকতে দেবে না। এখন মনে পড়ছে, আট মাস আগে এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ব্রেজিলের কোন হোটেলে গুলিবিদ্ধ —মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমার স্থির বিশ্বাস সেটা এদেরই কাজ। তার ওপর আমি লোকটা যে খুব পোষ মানার মতো নয় সেটাও ওরা বুঝে নিয়েছে। আমার মন বলছে ওদের মাল খালাস হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্যানটোসের কোথাও না কোথাও আমার মৃতদেহ দেখা যাবে। শুধু আমার নয়, তোমারও, তোমার খবরও নিশ্চয় এতদিনে ওদের দলের কাছে পৌঁছে গেছে। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যখন, ওরা ধরেই নিয়েছে তুমিও সব জানো। উঃ! শয়তান-দের বিশ্বাস করে আমি কি ভুলই করেছি।

বাবাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে রঙ্গ মামা? নিজের জীবনে যে দুর্যোগের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে তার জন্য উতলা নয়। বাবাকে এতটুকু শান্তি দেবার উপায় নেই বলেই রঙ্গ মামা খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো গজরাতে লাগল।

পরদিন সলোমন আর গোনডা এলো মামার সঙ্গে ভাব করতে। হাসি হাসি মুখে তার ঘরেই এসে বসল তারা। কোনোরকম ছলা-কলার ধার দিয়ে না গিয়ে সরাসরি বলল, এই জাহাজের মধ্যে বলতে গেলে তোমার ভগ্নিপতি তুমি আর আমরা দু'জন, এই চারজন এক ইউনিট, কিন্তু মিস্টার তরফদার আমাদের শুধু শত্রু ছাড়া আর কিছু ভাবছেন বলে মনে হয় না। কাল অত রাতে তিনি তোমার ঘরে এসে কি পরামর্শ করলেন তুমিই জানো, খবরটা লিসবনে ডক্টর জোহানকে জানাতে তিনি আমাদের আদেশ দিলেন এবারের এই কাজটাতে তোমাকেও দলে টেনে নিতে। তার মানে কাজ নির্বিঘ্নে চুকে-বুকে গেলে তোমারও প্রকাণ্ড লাভ। তুমি তোমার ভগ্নিপতি মিস্টার তরফদারকে একটু ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর দায়িত্ব পালন করতে বলো, তাঁর ব্যবহারে জাহাজের সমস্ত লোক অবাক হচ্ছে।

ওদের মাথা দুটো ছাতু করে দিতে ইচ্ছে করছিল রঙ্গ মামার। ওদের সঙ্গে ট্র্যানসমিটার আছে আর জাহাজের খুঁটিনাটি খবর দলের কাছে পৌঁছচ্ছে তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু রঙ্গ মামার চাতুরী ভিন্ন ধরনের। মুখ দেখে মন বোঝার সাধ্য নেই কারো। অন্তরঙ্গ খুশি মুখে গোনডার চুলের মুঠি ধরে তার মাথাসুদ্ধু কানটা মুখের কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, দোস্ত, তোমরা কিচ্ছু ভেবো না, আমার ভগ্নিপতি ওই রকমই একটু বোকা-সোকা লোক, তাকে আমি ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করছি। তোমরা শুধু তার ওপর নজর রাখাটা একটু কমাও, কাউকে আড়ি পাততে দেখলে তার মেজাজ বিগড়য়। কিন্তু আমাকে একটা কথা দিতে হবে তোমাদের, অপারেশন জিরোর পাকা মেম্বার করে নিতে হবে আমাদের, তোমরা দলকে জানিয়ে দিও আমার মতো যোগ্য ইঞ্জিনিয়ারের তোমাদের

প্রয়োজন আছে।

ওরা খুশি মুখে সায় দিল। এর পরের ক'টা দিন মামার সঙ্গে ওদের ভারী খাতির। রঙ্গ মামা ওদের দু'জনকে নিজের কেবিনে এনে দেদার খাওয়ায়, আর রঙ্গ-মসকরা করে ওদের মাতিয়ে রাখে। এক রাতে মদের ঝোঁকে গোনডা স্বীকারই করেছে, ভবিষ্যতে কার বরাতে কি আছে কে জানে, কিন্তু দলের মানুষ যদি ভুল না করে তো রঙ্গরাজ চন্দ্রভানকরকে সাদরে দলে টেনে নেওয়া উচিত। ডাঙায় পা দিয়ে তারা সে চেষ্টাই করবে।

কিন্তু ওপর-অলার প্ল্যানটি যে কত ভিন্ন আর কত মর্মান্তিক সে সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণা ছিল না। 'স্টীম-লাইন' তখন মাঝ দরিয়ায়। বিকেল থেকেই মনে হচ্ছিল দূরে কোথাও একটা কুয়াশার চাপ সৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া যন্ত্রে সমুদ্রের গতি-প্রকৃতিও ভালো মনে হচ্ছিল না। সামুদ্রিক কুয়াশার চাপ ভয়ঙ্কর জিনিস। সেই কুয়াশার মধ্যে পড়ে গেলে একেবারে অন্ধদশা। এক হাত দূরেও চোখ চলে না। তখন জাহাজ চালানো আদৌ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে। হাজার হাজার চোরা মৃত্যুদূত সেখানে ঘাপটি মেরে আছে। সেগুলি সমুদ্রের নীচের চোরা-পাহাড়।

অবস্থার কথা জানিয়ে বাবার অধীনের লোকেরা পরামর্শ চাইতে এলো কি করা যাবে এখন।

ঠাণ্ডা থমথমে মুখে বাবা হুকুম করল, জাহাজ যেমন চলছে তেমনি চলুক।

তারপর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আতঙ্কে দিশেহারা জাহাজের মানুষেরা। কুয়াশার এক অন্ধকার সমুদ্র গোটা জাহাজখানাকেই গ্রাস করে ফেলেছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না, জাহাজ কোথায় থামাবে, কোথায় নোঙর করবে? বাবার হুকুমে ফগ-হর্ন বাজিয়ে বাজিয়ে জাহাজ অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে। কোন দিকে চলছে তাও সঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না।

কলে স্তব্ধ, ভিতরে ভিতরে বাবার ওপর ক্রুদ্ধ। তাদের ধারণা,

বাবার গোঁ-ধরা মর্জির ফলেই মৃত্যু এগিয়ে আসছে সামনে। এমন কি রঙ্গ মামারও মনে হয়েছে, অশান্ত ক্ষোভে সকলকে নিয়ে বাবা যেন আত্মঘাতী হতে চলেছে।

আচমকা মৃত্যুর অমোঘ থাবা পড়ল জাহাজের গায়ে। এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বিশহাজার টনের 'স্টীম-লাইন' থরথর করে কেঁপে উঠল, তারপর স্থির। চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজের এক-দিকের তলা থেকে পেট বরাবর দু'ফাঁক হয়ে গেছে।

নাবিকদের আর্তনাদ, চিৎকার চেঁচামেচি ছোটাছুটি। কিন্তু কুয়াশার গহ্বরে ডুবে থাকার দরুন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, ধাক্কা খাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে। হু-হু করে জল ঢুকছে জাহাজের ভিতর। জাহাজ ডুবছে।

মৃত্যু, সামনে অবধারিত মৃত্যু।

নিজের কেবিনের সামনে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিল রঙ্গ মামা।

কোথা থেকে কে একজন ছুটে এসে তার হাত ধরল। তার হাতের আর্ক ল্যাম্পের আলোয় মামা দেখল হাত ধরেছে বাবা। ওই ল্যাম্পে দুর্ভেদ্য কুয়াশা ভেদ করেও কিছুটা দেখা যায়। বাবার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি।

শক্ত হাতে মামার হাত ধরে বাবা এক দিকে ছুট দিল। খানিকটা এসেই এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল দু'জনেই। দেখল, জাহাজের মেঝেতে বসে রেডিও-ট্র্যানসমিটারে চিৎকার করে কি বলাবলি করছে সলোমন, তার পাশে বসে আছে গোনডা। সেও চিৎকার করে ক্যাপ্টেনকে গালাগাল করছে।

আর্ক-ল্যাম্পের আলো ওদের মুখের ওপর পড়ল। পকেটের রিভলভার বাবার হাতে উঠে এলো। তারপর দুই গুলিতে ওরা দু'জনেই লুটিয়ে পড়ল।

রঙ্গ মামার হাত ধরে বাবা ছুটে নিজের কেবিনে চলে এলো। একটা কাগজ টেনে এনে খসখস করে চোখের পলকে আঁকল কি। তারপর জাহাজের নিশানা বসিয়ে তার ওপরেও কয়েকশ' সাংকেতিক

চিহ্ন এঁকে সেটা মামার পকেটে গুঁজে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, যদি বাঁচতে পারো, জাহাজ কোথায় ডুবল তার মোটামুটি একটু হদিস পাবে। অপারেশন জিরোর সোনা আর হীরের বাক্সগুলো কণ্ট্রোল রুমে নেই, সেগুলি আমি আগেই জাহাজের প্রেসারাইজড সিক্রেট চেম্বারে সরিয়ে ফেলেছিলাম, নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাকা করে সেগুলো ওদের হাতে দেব মতলব করেছিলাম, কোনো মতলবই কাজে লাগল না। জাহাজ ডুবছে দেখে স্ট্রং রুমের অন্য সোনা আর মোহরের কেস ক'টাও এক্ষুনি সেখানে রেখে—সেই গুপ্ত খুপরি কোথায় তারও সংকেত থাকল।

মামার হাত ধরে আবার তাকে টেনে সিঁড়ি চড়ে ছুটতে ছুটতে আর এক জায়গায় নিয়ে এলো বাবা। কিম্ভূতকিমাকার একটা জিনিস টেনে নিয়ে মামাকে বলল, পরে নাও এটা, শিগ্‌গির।

মামা জিগ্যেস করল, কি এটা?

স্কুবা গীয়ার। আমি জলের নীচে নামতাম মাঝেসাজে, একটাই ছিল।

পরমায়ু থাকলে বেঁচে যাবে। লাইফবোটে যারা যাচ্ছে এ দুর্যোগে তারা কেউ রক্ষা পাবে না।

মামা আর্তনাদ করে উঠল, আর তুমি দাদাজী?

নাবিকের সব থেকে গৌরবের জিনিসটি আমি নেব। বাঁচলে ছেলেকে আশীর্বাদ দিও, তোমার বোন যেন আমাকে ভুল না বোঝে।

বলতে বলতে বাবা একদিকে ছুট দিল। রঞ্জু মামা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

বাবা সব থেকে গৌরবের জিনিসটি নিতে গেল অর্থাৎ সকলের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করতে গেল তাও যেন মাথায় ঢুকছে না। তার পরনে স্কুবা গীয়ার অর্থাৎ ডুবুরীর পোশাক। অত্যধিক বাতাসের চাপে ভরাট, বায়ু নিয়ন্ত্রণের সিলিণ্ডার আছে এর সঙ্গে, তার নলের ভিতর দিয়ে মুখে আঁটা মুখোশের মধ্যে এই বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা। তাছাড়া, দুর্জয় ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এতে আছে

ফোস নিওপ্রিন, আর এরই সঙ্গে আছে ছুরি, কম্পাস, জল মাপার যন্ত্র, ঘড়ি আর ভেসে বেড়াবার সরঞ্জাম।

জাহাজের সাইরেন আর্তনাদ করেই চলেছে। হু-হু করে জল উঠছে আর জাহাজ ডুবছে। সর্বসমেত মাত্র চব্বিশ মিনিটের মধ্যে বিশ হাজার টনের 'ষ্টীম-লাইন' তিরিশ চল্লিশ জন নাবিক আর দুটো মৃতদেহ নিয়ে সমুদ্রের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি নাবিকেরা লাইফবোটে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরও আর হদিস মিলল না।

সেই রাক্ষসী কুয়াশার মধ্যে সমুদ্রের জলে ভাসছে একটি মানুষ। আমার মামা রঙ্গরাজ চন্দ্রভানকর।

টানা একত্রিশ দিন চলেছিল সমুদ্রের ওপর এই মানুষের জীবন আর মৃত্যুর লড়াই। সেই লড়াইয়ের বৃত্তান্ত শুনেও শরীরের রক্ত হিম হওয়ার দাখিল। মনে হয় এক রঙ্গ মামা ছাড়া আর কেউ ও-ভাবে মৃত্যু থেকে জীবনকে ছিনিয়ে নিতে পারত না।

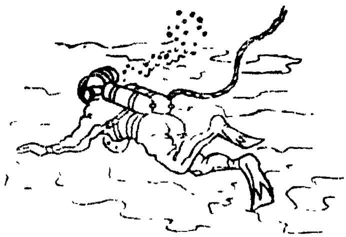
ডুবন্ত 'ষ্টীম-লাইনের' নাবিকরা বা সলোমন আর গোনডা তাদের ট্র্যানসমিটারে ডাঙার মানুষদের কাছে কোন পর্যন্ত খবর পাঠাতে পেরেছিল রঙ্গ মামার জানা নেই। কিন্তু লোকালয়ে এসে জানতে পারল, ক্যাপ্টেন হিসাবে বাবার রীতিমতো দুর্নাম হয়ে গেছে! অনেক খবরের কাগজে ক্যাপ্টেন তরফদারের খেয়ালিপনার কথা ছাপা হয়েছে। দুর্যোগ আর কুয়াশার ঝড়ে জাহাজ ছোটানোর চেষ্টাটা সকলেই অবিবেচনার কাজ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। সব থেকে বেশি চটেছে ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা। নাবিকদের জীবন আর মালের নিরাপত্তা ইনসিওর করা ছিল। চোরাই হীরে সোনার খবর কেউ রাখে না, কিন্তু সে ছাড়াও তো বহু সোনার বার আর মোহর বৈধভাবে চালান যাচ্ছিল। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ পাউণ্ড খেসারত দিতে হয়েছে ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে। ডুবন্ত জাহাজ এখন ওই ইনসিওরেন্স কোম্পানির সম্পত্তি কিন্তু অজানা সমুদ্র গহ্বর থেকে সে সম্পত্তি উদ্ধারের আশা দুরাশা।

একটি মাত্র মানুষ বেঁচেছে সেই খবরটাও জানাজানি হয়ে গেল

আর খবরের কাগজে বেরুলো। একত্রিশ দিন বাদে সমুদ্রতটের মানুষ রঙ্গ মামাকে উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে চালান করেছিল। সুস্থ হবার পর পুলিসের জেরার ফলেই দুর্ঘটনার বিবরণ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা মামার কাছে ছোটাছুটি করেছে, জাহাজ কোথায় ডুবেছে মামা যদি সঠিক হদিস দিতে পারে। ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য মামাকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছে তারা। কিন্তু মামাকে অম্লানবদনে মিছে কথা বলতে হয়েছে। কারণ সমুদ্রের তলা থেকে জাহাজ উদ্ধার হলে কোটি কোটি টাকার সোনা আর হীরে চালানের ব্যাপারটাও জানাজানি হয়ে যাবে। আর বাবার নামে তখন দুর্নামের টি-টি পড়ে যাবে। ক্যাপ্টেনের অজ্ঞাতে তো আর অত সোনা-হীরের চোরাই চালান সম্ভব নয়। অথচ রঙ্গ মামা মনে-প্রাণে চায় জাহাজ উদ্ধার হোক, উদ্ধার হলে বাবা যেন অনেকখানি ঋণমুক্ত হতে পারে।

শুধু একজনের কাছে রঙ্গ মামা সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি বলেছে এবং পরামর্শ করেছে। মা-কে বলেছে, মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। তখনো শোকে অধীর অবস্থা মায়ের, সব শোনার পর পাথর একেবারে। শেষে আত্মস্থ হয়ে মামাকে বলেছে, বাবাকে ঋণমুক্ত করতেই হবে, ওই ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের শেষ চেষ্টা করতে হবে। আমাকে বলেছে, তুমি যদি না পারো, আমার ছেলে সেই চেষ্টা করবে, আমি তাকে সেইভাবেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

মা, মা-গো, তুমি বীর মাতা কিনা জানি না, বীর-পত্নী যে এ সত্য সত্য সত্য। আমি তোমার যোগ্য ছেলে হতে চেষ্টা করব।



মা আর মামা দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করেছে জাহাজ-ডুবি বা চোরাই হীরে-সোনার যেটুকু হদিস জানা আছে তার সবটুকুই গোপন থাকবে। বে-সরকারীভাবে অনুসন্ধান চালানোর চেষ্টা মামা করে যাবে। যদি বিশ্বস্ত পয়সাঅলা লোক সংগ্রহ করে ছোট একটা সন্ধানী দল গঠন করা যায় তবেই ওই ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের চেষ্টা হবে। অবশ্য সে-ক্ষেত্রে দলের লোকের কাছে গোপনতা ফাঁস করতেই হবে, নইলে জীবন আর লক্ষ লক্ষ টাকার ঝুঁকি নিয়ে কেউ এগিয়ে আসবে কেন? না, চোরাই হীরে বা সোনার ওপর মায়ের অন্তত বিন্দুমাত্র লোভ নেই, তার স্থির বিশ্বাস সত্য প্রকাশ হয়ে গেলেও লোকে তখন অনেক কথাই বিশ্বাস করবে। মোট কথা, সমুদ্রের গর্ভ থেকে ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধার করার একমাত্র স্বপ্ন নিয়েই মা এ যাবত স্থির হয়ে কাল কাটিয়েছে। তার স্থির বিশ্বাস, বাবা নিষ্পাপ, তাই একদিন না একদিন ওই অসাধ্য সাধনও সম্ভব হবে।

কিন্তু এদিকে নানা রকম বিপদের সূচনা দেখা যেতে লাগল। ডুবন্ত 'স্ট্রীম-লাইন' থেকে একটি মাত্র মানুষ বেঁচে ফিরেছে আর সেই মানুষ বাবার শ্যালক রঙ্গরাজ চন্দ্রভানকর, এ খবর শত্রুপক্ষ অর্থাৎ অপারেশন জিরোর দলের মানুষ তো জেনেছে। গোটা পৃথিবীতে ওদের জাল ছড়ানো, রঙ্গ মামা তাদের কাছ থেকে অব্যাহতি পাবে কি করে? রাগে ক্ষোভে পারলে তো তারা বাবার আত্মাকে টেনে এনে

জাহাজ উদ্ধারের কাজে লাগায়। ষোলো সতেরো কোটি টাকার হীরে আর সোনা খুইয়ে তারা তো নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়ছে। এ ছাড়া ট্রানসমিটারে সলোমন আর গোনডার কাছ থেকে তারা যে খবর পেয়েছে তাতে ওদের স্থির বিশ্বাস চোরাই চালানের ব্যাপারটা রঙ্গ মামা নিশ্চয় জানে। তাদের আরো সন্দেহ, রঙ্গ মামা ডুবুরীদের পোশাক স্কুবা গীয়ার পেল কি করে? কাগজে লেখা হয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেনের একটা স্কুবা গীয়ার ছিল। তা সে পোশাক পরে ক্যাপ্টেন নিজের প্রাণ রক্ষা না করে রঙ্গ মামাকে বাঁচাতে গেল কেন?

মোট কথা তাদের মগজে অনেক রকমের সন্দেহ আনাগোনা করেছে যার ফলে মামাকে তারা নানাভাবে জালে আটকাতে চেষ্টা করেছে। অজানা অচেনা লোকেরা এসে মামার সঙ্গে দেখা করেছে, ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের চেষ্টায় টোপ ফেলেছে। রঙ্গ মামা নিরীহ বোকা-বোকা মুখে ওদের ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ওই জাহাজে কিছু ভাঙা লোহা-লকড় ছাড়া আর কিছু পাবে না, যে ভাবে চুরমার হয়েছে, সব কোথায় ভেসে গেছে ঠিক আছে। তাছাড়া বলেছে, সমুদ্রের নাম শুনলে তার গায়ে জ্বর আসে, আবার সমুদ্রে ডোবা!

অনেক চেষ্টার পরেও ব্যর্থ হবার ফলে ওই ঘটনার বছর তিনেক বাদে ব্রেজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে রঙ্গ মামাকে সুকৌশলে বন্দীও করেছিল অপারেশন জিরোর দল। নাকের ডগায় রিভলভার নাচিয়ে তার পেট থেকে কথা বার করে নিতে চেষ্টা করেছে, কি জানো বলো, নইলে মৃত্যু অনিবার্য।

ওরা যেটুকু জানে রঙ্গ মামা শুধু সেইটুকুই বলেছে। আর রাগত মুখ করে বলেছে, শেষ সময়ে ক্যাপ্টেনের মাথার গোলমাল হয়েছিল, যার ফলে ওই অঘটন। নাকের ডগায় রিভলভার নাচানো সত্বেও মামা ওদের দলভুক্ত হয়ে ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারে যোগ দিতে রাজি হয়নি। বলেছে, ওই অসম্ভব কাজে নেমে অনেক দিন ধরে তিলে তিলে মরতে রাজি নই, তার থেকে একবারেই খতম করে দাও, বাবারে বাবা, টানা একত্রিশ দিন জলে ভেসে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে।

রঙ্গ মামার কি রকম ধারণা হয়েছিল, ওরা কিছুতে তাকে প্রাণে মারবে না, কারণ, মামার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের শেষ ক্ষীণ আশা-টুকুও নির্মূল হয়ে যাবে। মামার ধারণাই ঠিক, অনেক রকমের টানা হেঁচড়া করে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়েই দিল ওরা। কিন্তু মামা ঠিক জানে, ছেড়ে দিয়ে ওরা তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। ওদের সন্দেহ, বাবা মামাকে গোপন হদিস কিছু দিয়েই গেছে, অতএব মামার চাল-চলন গতিবিধির ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু রঙ্গ মামাও কম তুখোড় লোক নয়। প্রথম বছর পাঁচেক প্রায় অকর্মণ্যের মতোই কাটিয়ে দিল। তারপর এ-জাহাজ ও-জাহাজে কিছু কিছু সাময়িক কাজ করে বেড়াতে লাগল। আর এদিকে জলবিদ্যা নৌ-বিদ্যার অনেক রকমের গবেষণা নিয়ে মেতে থাকল। এতেও তার নাম ডাক মন্দ ছড়ালো না।

মাত্র বছর কয়েক হল রঙ্গ মামার ধারণা হয়েছে এখন আর কেউ তার ওপর লক্ষ্য রাখছে না। এরকম অনিশ্চিত আশার হাল লোকে আর কতকাল ধরে বসে থাকতে পারে? কিন্তু গত বিশ বছরের মধ্যে রঙ্গ মামা একটি দিনের জন্যেও লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। লিসবন বা ব্রেজিলের কোনো জাহাজ থেকে ডাক এলেই সে ওই চাকরি নিত; জাহাজে লিসবন থেকে স্যানটোসে পাড়ি দিয়েছে বহুবার। বাবার দেওয়া সেই নক্সার সাহায্যে কোনদিকে সেই অভিশপ্ত জাহাজ 'ষ্টীম-লাইন' ভেসে গেছল আর কোথায় কতদূরে গিয়ে ডুবেছিল তার একটা মোটামুটি আভাস মনের তলায় দানা বেঁধে উঠেছে।

কিন্তু বে-সরকারীভাবে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সমুদ্র গর্ভ থেকে সেই জাহাজ উদ্ধারের চেষ্টা করবে কি করে? ছোট-খাট একটা সাবমেরিন তৈরি করতেও বহু লক্ষ টাকা লেগে যাবে। তার ওপর অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামও তো আছেই।

তবু, সিদ্ধির একমাত্র উপায় চেষ্টা করে যাওয়া। তলায় তলায়

মামা বছরের পর বছর সেই চেষ্টাই করে আসছে। নিজে টাকা সংগ্রহ করেছে আর সেই রকম বিশ্বস্ত মানুষ খুঁজেছে যার অঢেল টাকা আছে আর মৃত্যুপণ অভিযানের হিম্মৎ আছে। বছর দুই হল সেই রকম মানুষই একজন পেয়েছে। ব্রেজিলের লোক। নাম জিম আলবার্ট শিলভা—নামের আদ্যাক্ষর জে, এ, এস, জুড়ে পরিচিত মহল তাকে ডাকে জ্যাস বলে। তার বয়েস মামার থেকে কিছু ছোট হবে, খুব মেজাজী অথচ দিলদরিয়া মানুষ। রঙ্গ মামার তাকে চেনা আর জানাটা একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে দু'বছর যাবত। জ্যাস-এর মাঝারিগোছের একটা স্টীম-বোট মেরামতির কারখানা আছে। সেই ব্যবসাতেই ফুলে ফেঁপে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। এখন অঢেল টাকা তার। শুধু মেরামত নয়, ছোটখাটো স্টীম-বোট এখন তৈরিও করছে সে। সেগুলো সস্তায় দেয় বলে মাছ-শিকারী-দলের ভারী প্রিয়পাত্র। রঙ্গ মামাকে সে বলেছে, অবস্থার উন্নতি করতে চায় যে, সে-ই আমার প্রীতির পাত্র, আমার সে রকম টাকা থাকলে জীবন-যুদ্ধের সৈনিকদের আমি দু'হাতে বিলিয়ে দিতুম। গরিবীয়ানার সঙ্গে আমার কোনোরকম আপোস নেই।

রঙ্গ মামা এক-নাগাড়ে বেশ কিছুকাল ব্রেজিলেই থেকে গেছল। আসলে মামা ওই লোকটাকে ভালো করে জানা আর বোঝার জন্যেই সেখানে বাস করছিল। তখন জ্যাস-এর দুঃসাহসিক আচার-আচরণ দেখে নিয়েছে। জ্যাস তাকে ধমকাতো, তুমি একটা অকর্মণ্য ভবঘুরে, আমি কাজের মানুষ, আমার সঙ্গে এত ভাবসাব করে আমার সময় নষ্ট করো কেন?

কারখানায় গেলে কখনো ঝাঁঝিয়ে উঠে বলত, ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই এখন আমার। গেট আউট। রঙ্গ মামা দিন কয়েক গা ঢাকা দিয়ে থেকেই আবার তার খোঁজ করত। বলত, তুমি রগড়ের মানুষ, তোমার রসিকতা না শুনলে আমার ভালো হজম হতে চায় না।

রঙ্গ মামা হঠাৎ একদিন খবর পেল জনাকয়েক বিশ্বস্ত লোক

জুটিয়ে জ্যাস ব্রেজিলের গভীর অরণ্যে যাত্রার উদ্যোগ করছে। মামা অবাক। ব্রেজিলের জঙ্গল ভয়াবহ ব্যাপার। তাছাড়া স্টীম-বোট ব্যবসায়ী জঙ্গলে যাবে কি জন্যে? কোনোরকম রত্ন খনি-টনির সন্ধান পেল? মাছ বা হাঙর বা তিমি শিকারের দলের সঙ্গে তাকে বার কয়েক যেতে দেখেছে, কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার। নিছক দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার। এ-ক্ষেত্রে জানতে পারল, কোনো বড় শিকারীর দলের সঙ্গেও যাচ্ছে না সে, এ-দলের সে-ই পাণ্ডা। কিন্তু ভালো শিকারী এমন সুনাম তো কিছু নেই জ্যাস-এর? সাহস আছে বলে লোকটা কি শেষ পর্যন্ত বে-ঘোরে মারা পড়বার জন্য ছুটছে?

রঙ্গ মামার জেরার ফলে জ্যাস চটেই গেল প্রথম। খেঁকিয়ে উঠল, আমি জঙ্গলে যাই বা জাহান্নামে যাই তাতে তোমার কি? তুমি ভেতো ইণ্ডিয়ান, নরম পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোও গে যাও।

রঙ্গ মামা নাছোড়বান্দা তবু, কেবল এক কথা, কেন যাবে বলো?

জ্যাস গরম, কেন, বলব কেন?

বলবে, কারণ আমি তোর বন্ধু, সত্যিকারের বন্ধুকে আমরা প্রাণ গেলেও অবিশ্বাস করি না। সত্যি কথা বললে তোমার সাহায্যের জন্য আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

জ্যাস এবারে হেসে সারা! ঠিক সেই সময় তার জঙ্গল যাত্রার সঙ্গী দুটো বডিগার্ড এসে হাজির। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের দুটো ষণ্ডা পর্তুগীজ। জ্যাস হেসে তাদের বললে, আমাদের কি সৌভাগ্য, এই ননীরপুতুল আমার সাহায্যের জন্য জঙ্গলে যাবে!

প্রভুর সঙ্গে সহচর দুটোও প্রচুর হাসতে লাগল। একজন আবার টিপ্পনী কাটল, কোনো ভীষণ জানোয়ার আক্রমণ করলে ইনি আগে জীবন দান করে আমাদের রক্ষা করবেন নাকি?

রসিকতা শুনে অন্য লোকটা আরো জোরে হেসে উঠল। কথা-বার্তা নেই, রঙ্গ মামা এগিয়ে এসে ঠাস ঠাস করে দু'জনের গালে আচমকা দুই চড়।

ওদের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠতে পাঁচ সেকেণ্ডও লাগল না। দুজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো রঙ্গ মামার ওপর। ও-রকম অপমান ওরা বরদাস্ত করার পাত্র নয়। কিন্তু রঙ্গ মামাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ওই পেল্লায় চড় দুটো বসিয়েছিল। তার পরের কাণ্ড দেখে জ্যাস ছেড়ে ওই ষণ্ডা লোক দুটোও হাঁ। ওরা দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। শরীরের হাড়গোড় ভাঙা বিচিত্র নয়, কারণ রঙ্গ মামা চোখের পলকে এক বিচিত্র প্যাঁচ মেরে এক জনকে সোজা মাথার ওপর তুলে কয়েক পাক বনবন করে ঘুরিয়ে অন্যজনের গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরেছে। তারপর দু'জনেই মাটিতে লপ্টা-লপ্টি। কিন্তু যন্ত্রণা ভুলে ওরাও বিস্ফারিত চোখে মামাকে দেখছে। বিস্ময় কাটার পরেও জ্যাস মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ মামার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু রঙ্গ মামা আবার তেমনি হাবাগোবা ভালো মানুষ। জ্যাস উঠে এসে মামাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। বলে উঠল, তুমি, তুমি আমার বন্ধু হবার যোগ্য লোক বটে।

নিরীহ মুখে মামা জিগ্যেস করল, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছ তাহলে?

নিশ্চয়।

কিন্তু জঙ্গলে কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছ সেটা আগে বলে ফেলো দেখি?

জ্যাস চোখের ইশারায় সহচর দু'জনকে চলে যেতে বলল। যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে কোনোরকম উঠে তারা প্রস্থান করল।

গলা খাটো করে জ্যাস বলল, যাচ্ছি জন্তু-জানোয়ারদের একটি কঙ্কাল ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে।

দুর্বোধ্য উদ্দেশ্যটা খোলাখুলিই বলল সে এরপর। জ্যাস খবর পেয়েছে ব্রেজিলের জঙ্গলের বহু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারও মরার আগে কোনো এক নির্জন জায়গায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে প্রাণত্যাগ করে। গভীর জঙ্গলের সেই নির্জন জায়গাটি নাকি ওদের কঙ্কালের পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে এখন। সেই কঙ্কাল-পাহাড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারলে হাড়ের ব্যবসা করেও সে লাখ-লাখ টাকা

কামাতে পারবে।

ব্যাপারটা যে সত্যি রঙ্গ মামা জানে। বহু হাতি গণ্ডারও অনেক সময় তাদের মরার জায়গা বেছে নেয়। কিন্তু অঢেল টাকার মালিক জ্যাস এরকম একটা বিপজ্জনক লোভে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ভেবে অবাক রঙ্গ মামা। বলল, এরই জন্যে তুমি এরকম ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ? ব্রেজিলের জঙ্গলের সেসব জায়গায় যাওয়া কি ব্যাপার তোমার জানা আছে?

জ্যাস জবাব দিল, টাকার গন্ধ পেলে আমি রসাতলেও যেতে পারি, তোমার ভয় ধরে থাকে তো তুমি কেটে পড়ো।

রঙ্গ মামার মনে হল, এতকাল ধরে সে যে প্রতীক্ষায় আছে সেটা বলে ফেলার এই স্বুবর্ণ মুহূর্ত। লোকটার এত টাকা তবু টাকা টাকা করে পাগল, তার ওপর স্টীম-বোট তৈরি করছে ইদানীং, এই সব-কিছু দেখেই তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করছিল এতদিন ধরে।

গম্ভীর মুখে বলল, আমি যদি এর থেকে হাজার-হাজার গুণ বেশি টাকার গন্ধের খবর দিতে পারি, তোমার ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস আছে?

জ্যাস বলল, আমার সাহসের খবর তুমি আর কি জানো···কিন্তু তোমার মাথার কিছু গণ্ডগোল হয়নি তো? অত টাকার হদিস পেয়েও নিজে তুমি চুপ করে বসে আছ কেন?

বসে আছি কোনো বন্ধুর আশায়, আমার নিজের কেরামতিতে সে কুবেরের ভাণ্ডার উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

সে ভাণ্ডারটি কোথায়?

সমুদ্রের তলায়।

জ্যাস গোল গোল চোখ করে মামাকে দেখতে লাগল। তারপর মামাকে বলল, বুঝলাম, এবারে তুমি কেটে পড়ো।

কিছুই বোঝোনি, আমার মাথাটা তোমার থেকে নিরেট নয় এর প্রমাণ যদি চাও আজ রাত দশটার পরে আমার হোটেলে এসো।

রঙ্গ মামা গটমট করে উঠে এলো। পিছনে জ্যাসের ব্যঙ্গ মন্তব্য শোনা গেল, ম্যাড ক্যাপ!

কিন্তু রঙ্গ মামা জানতো জ্যাস ঠিকই আসবে তার হোটেলে। টাকার নাম শুনলে লোকটার রক্ত চনমন করে ওঠে। তাছাড়া বেপরোয়া সাহসীও বটে।

রাত ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাস তার হোটেলের ঘরে এসে হাজির। তরল গলায় বলল, তোমার আষাঢ়ে গল্প শুনতে এলাম। কিন্তু বেশি বাজে বকলে গাঁট্টা খাবে বলে দিলাম।

মামাও রসিকতা করে জবাব দিল, তোমার জোয়ান ছুটোর হাল দেখার পরেও হাত উঠবে?

পকেট থেকে ছোট একটা রিভলবার বার করল জ্যাস, বলল, গাঁট্টা তো এটা দিয়েও মারতে পারি।

মামা তাড়াতাড়ি ভয়ার্ত স্বরে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, ওটা পকেটে পোরো, আমি গাঁজায় দম দিয়ে তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছি না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে জ্যাসকে নিয়ে বসল রঙ্গ মামা। তোরঙ্গ থেকে বহুকালের পুরনো খবরের কাগজ বার করে 'স্টীম লাইন' ডুবে যাওয়ার খবরটা দেখালো।

সব দেখেশুনে এবং পড়ে জ্যাস জিজ্ঞাসা করল, তাতে কি হল?

রঙ্গ মামা বলল, আমি এই জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, আর আমার ভগ্নিপতি খোদ ক্যাপ্টেন ছিল।

তাতেই বা কি হল?

এবারে আদ্যোপান্ত তাকে ব্যাপারখানা খুলে বলল রঙ্গ মামা। অপারেশন জিরোর কথা, ডক্টর জোহানের কথা, আট বাক্স বোঝাই সোনা আর হীরে চালান দেবার কথা, সলোমন আর গোনডার কথা, জাহাজ ডুবির কথা, আর সব শেষে নিজের উদ্ধার পাওয়ার কথা।

শোনার পর জ্যাস বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে

লাগল। শেষে বলল, সবই না-হয় বুঝলাম আর বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এ-সম্পদ তুমি উদ্ধার করতে পারবে এমন আশা করো কি করে? এবারে রঙ্গ মামা তার মোক্ষম অস্ত্রটি বার করল, শেষ মুহূর্তে দেওয়া বাবার সেই নকশা। জাহাজ কোথায় ডুবেছে তার সংকেত আর সেই গুপ্ত কুঠুরির নিশানা বসানো কাগজখানা দেখেও জ্যাস কিছুই বুঝল না। রঙ্গ মামা বলল, এ তোমার বোঝবার কথাও নয়, দুনিয়ায় একমাত্র আমি ছাড়া এই নিশানা ধরে আর কেউ সেই ভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে না। জ্যাস অনেকখানি অভিভূত হয়েছে বটে, কিন্তু তার সংশয় যায় না। বলল, সবই না হয় সত্যি কিন্তু অ্যাটলান্টিকের সমুদ্রের তলায় হাতড়ে বেড়াবার মতো ডিপ ডাইভিং সাবমেরিন কোথায় পাবে, গোপনে এ তল্লাসি সম্ভব হবে কি করে? সব হবে, তুমি কিছু টাকা খরচ করতে পারলেই হবে, অবশ্য আমিও যতটা সম্ভব খরচ করব, কিন্তু দরকারের তুলনায় সে কিছুই নয়। তবু অন্যের যা লাগবে আমাদের তার তিন ভাগের এক ভাগ খরচ পড়বে, কারণ আমার স্কীম অনুযায়ী সেই সর্বাধুনিক ছোট্ট ডুবোজাহাজটি তুমি তোমার কারখানায় তৈরি করবে।

জ্যাস আবার অবাক।

রঙ্গ মামা তখন তার নিজের কৃতিত্বের কাগজ-পত্র সব জ্যাসকে দেখালো। সে যে কতবড় একজন ইঞ্জিনিয়ার তার প্রমাণ। তাছাড়া, কত জাহাজ কোম্পানি তার স্পেসিফিকেশন নিয়ে কত কি তৈরি করেছে তারও দলিল-পত্র। সব শেষে রঙ্গ মামা তার নতুন পরিকল্পনার অর্থাৎ সর্বাধুনিক গভীর জলের ছোট্ট ডুবোজাহাজের নকশাটা তার সামনে খুলে ধরল। মাত্র চব্বিশ হাত লম্বা আর দশ হাত চওড়া এমন এক ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব জ্যাস কল্পনাও করতে পারে না।

কিন্তু নকশা থেকে সেই সম্ভাব্য ডুবোজাহাজের খুঁটিনাটি বুঝে নেবার পর আনন্দে আর উত্তেজনায় জ্যাস থরো থরো কাঁপতে লাগল। আনন্দের আতিশয্যে সে মামাকে জাপটে ধরে গোটাকতক

চুমুই খেয়ে ফেলল। স্বীকার করল, রঙ্গ মামার মতো এমন দুঃসাহসী জিনিয়াস এত বয়েস পর্যন্ত আর দেখে নি। কিন্তু এরপরে খটাখটি বাদল লেনদেনের কথাবার্তা নিয়ে। সমস্ত সাজ-সরঞ্জামসহ ওই ক্ষুদে ডুবোজাহাজ সম্পূর্ণ হতে চলল। পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে। সেও জ্যাসের কারখানায় হবে বলে। মামা খুব বেশি হলে লাখ তিনেকের বেশি দিতে পারবে না। যদিও আমি জানি মামা ইচ্ছে করলে তার তিন গুণ দিতে পারে। জ্যাস-এর গোঁ, তোমাকে অন্তত তিনভাগের এক ভাগ খরচ দিতে হবে আর রত্ন-ভাণ্ডার উদ্ধার হলে জ্যাস নেবে দশ আনা আর মামা ছ'আনা।

রঙ্গ মামা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, তোমার সঙ্গে কাজে নামা আমার আর তাহলে হল না, কারণ সমুদ্রের তলার ওই ভাণ্ডারের আর একজন অংশীদার আছে, সে ক্যাপ্টেন তরফদারের ছেলে শংকর তরফদার। সে-ও আমাদের সঙ্গে অভিযানে যাবে। বলতে গেলে সমস্ত সম্পদই তার প্রাপ্য, তার বদলে প্রথমেই তাকে কলা দেখাবার মতলব করলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

জ্যাস রেগে মেগে চলে গেল। কিন্তু রঙ্গ মামা ঠিক জানে পরদিনই সে আবার আসবে, না এসে পারবে না। এলো। এসে উদার প্রস্তাব দিল, ঠিক আছে, চার আনা চার আনা আট আনা তোমাদের মামা-ভাগ্নের আর বাকি আট আনা আমার।

রঙ্গ মামা মাথা নাড়ল, তা হয় না, দশ আনা আমাদের দুজনের আর বাকি ছ'আনা তোমার। জ্যাস আবার ক্ষেপে উঠতেই মামা ঠাণ্ডা মুখে বলে দিল, দেখো শুরুতেই যখন তোমার সঙ্গে খটাখটি বাধছে তখন এ নিয়ে আর তোমার মাথা গরম করতে হবে না, আমি অন্য চেষ্টা দেখছি।

জ্যাস গাঁ-গাঁ করে বলে উঠল, কে টাকার ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে তোমার জন্যে আর কে-ই বা গোপনে অমন একখানা ডুবোজাহাজ তৈরি করে দেবে?

রঙ্গ মামা হাবাগোবা মুখ করে জবাব দিল, সমুদ্রের তলার ছ'

আনা সম্পদের অংশ ছাড়া ওই ডুবোজাহাজ তৈরির প্ল্যানও দিয়ে দেব বললে ছুটে আসার মতো লোক পাব, আমাকে এক পয়সাও দিতে হবে না। কারণ, শুধু ওই প্ল্যানমাফিক ক্ষুদে ডুবোজাহাজ তৈরি করেও তার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হবে।

মামার মুখের দিকে চেয়ে জ্যাস থমকালো একটু। বলল, তুমি মহাচতুর দেখি, ডুবোজাহাজের প্ল্যানের মালিকানার দাবিও রাখছ এর ওপর ?

আলবৎ! মামা জোর দিয়ে বলে উঠল, কিন্তু আমি আর এরপর তোমাকে বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করতে পারছি না, ওই প্ল্যানে ডুবোজাহাজ তৈরি করার পর প্ল্যানটা তুমি মেরেই দেবে মনে হচ্ছে, একটা জাহাজ তৈরির পর আরো পঞ্চাশটা তৈরি করলেও আমি আটকাব কি করে ? জ্যাস-এর আঁতে ঘা পড়ল একেবারে। কি ! বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করতে পারছ না ? আমাকে অবিশ্বাস, ঠিক আছে, ওই প্ল্যান আমার, সমস্ত খরচ আমার, তোমাকে এক পয়সাও দিতে হবে না, কাজ শেষ হবার পর পঞ্চাশখানা ছেড়ে ও রকম পাঁচশ ক্ষুদে ডুবোজাহাজ তৈরি করলেও তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তোমার সঙ্গে আমার শুধু এই একটি অভিযানের চুক্তি, সেটা সফল হলে তোমরা মামা-ভাগ্নে সমুদ্রের তলার ওই সম্পদের দশআনা অংশ পাবে, আর আমি ছ' আনা। তারপর তোমরা জাহান্নমে যাও।···হল ?

রঙ্গ মামা তবু মাথা নাড়ছে, হল না।

জ্যাস দাঁত কড়মড় করে উঠল, না মানে, আবার কি ?

আরো কিছু চাই।

ভয়ানক চটে গিয়ে জ্যাস গটগট করে করে দরজা পর্যন্ত চলে গেল। ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙেছে তার, রঙ্গ মামার মুখ দেখারও ইচ্ছে নেই আর। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে রাগত মুখেই ঘুরে দাঁড়াল তবু। আর কি চাই, সমুদ্রের তলার ষোল আনা অংশ ?

মুখ কাঁচুমাচু করে মামা জবাব দিল, না ঠিক তা না···

জ্যাস গর্জে উঠল, তাহলে আর কি চাই বলো ?

তোমার হাসি-মুখখানা দেখতে চাই, বুঝতেই পারছ এমন এক দুঃসাহসিক ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছি এক সঙ্গে ···।

বোকা বনে গিয়ে জ্যাস হা-হা শব্দে হেসে উঠল, তারপর এগিয়ে এসে মামার পিঠ চাপড়ে বলল, আমি ছেড়ে খোদ শয়তানও তোমার ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকবে না।

রঙ্গ মামার স্কীম অনুযায়ী প্রায় দেড় বছরের চেষ্টায় সেই ক্ষুদে ডুবোজাহাজের কাজ শেষ হয়েছে। এই সময়টা মামা ব্রেজিল থেকে এক পা নড়েনি। ডুবোজাহাজ তৈরির কাজ শুরু হত গভীর রাত্রিতে। রাত্রিতে রোজই মামা জ্যাসের কারখানায় যেত। কারখানার লোকেরা মামাকে মালিকের বন্ধু স্থানীয় রাতের কর্মচারী ভাবত। জনা-কতক মাত্র বিশ্বস্ত লোক নিয়ে ওই ক্ষুদে সাবমেরিন তৈরির পর্ব শেষ হয়ে এসেছে। তখন মামা এসেছে তার ভাগ্নেকে অর্থাৎ আমাকে নিয়ে যেতে।

ক্ষুদে সাবমেরিনের নাম দেওয়া হয়েছে 'সী-হক' অর্থাৎ সামুদ্রিক বাজ। মামার বিশ্বাস বাজ পাখির মতোই অব্যর্থ-সন্ধানী গতি হবে তার। ফিরে গিয়ে আমরা 'সী-হক'কে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ দেখতে পাব। আমরা ব্রেজিল-এ উপস্থিত হওয়ার দিনকয়েকের মধ্যেই আসল অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারব। অবশ্য তার আগে 'সী-হক'কে জলে নামিয়ে মহড়া দিতে হবে। মামা নিশ্চিন্ত, দুর্বার 'সী-হক'-এর ব্যবহারটি তার হাতে পোষা পাখির মতোই হবে।



আমি শঙ্কর তরফদার, এই বোম্বাই শহরের ছোট-খাট একটি বিখ্যাত ব্যক্তি।

এই ছাব্বিশ বছর বয়েসের মধ্যেই বেশ গোটাকতক দুঃসাহসিকতার নজির রাখতে পেরেছি। কিন্তু এমন রোমাঞ্চ আর কখনো অনুভব করিনি। উত্তেজনায় আর উদ্দীপনায় আমি ভরপুর।

যাত্রার আগের রাতে মা আমার সামনে এসে বসল। বরাবরকার মতোই শান্ত ঠাণ্ডা মুখ। এই মুখ দেখেই বোঝা যায় একমাত্র ছেলেকে সাগর তলের অনিশ্চয়তার মধ্যে পাঠানোর ব্যাপারে মা-কে নিজের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। মায়ের দিকে চেয়ে মনে মনে বললাম, মা লীলা তরফদার, তুমি মহীয়সী বটে, আমার সব শক্তি সব সাহসের মূলে তুমি।

আমি চেয়ে আছি দেখে মা হাসতে চেষ্টা করল একটু। জিগ্যেস করল, কি দেখছিস?

তোমাকে।

কেন ভয়টয় করছে নাকি?

করছে, তোমার জন্যে, তুমি কেন একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছ না?

মা আবারও হাসল একটু। বলল, দূর পাগল, না পারলে তোকে পাঠাচ্ছি কি করে? তারপর একটু বিমনা মুখে বলল, সত্যের

জয় হবেই, তোর বাবার দুর্নামও ঘুচবে, আমি শুধু আশা করব সেটাই একমাত্র লক্ষ্য হবে তোর। সফল হবার পরেও কোনো লোভ যেন তোকে পেয়ে না বসে।

মা কি বলতে চায় ঠিক বোঝা গেল না। মনে হল, অঢেল বিত্তকে মা বোধহয় ভয় করে। বিপুল ঐশ্বর্য হাতে এলে আমার মতিগতি কি হবে সেই দুর্ভাবনা বোধহয়। ডুবন্ত জাহাজ 'স্টীম-লাইন' উদ্ধার হলে চোরাই সোনা আর হীরের বাক্সগুলো বাদে আর সমস্ত সম্পদ ইনসিওরেন্স কোম্পানির প্রাপ্য। সেটা তাদের ফিরিয়ে দেব। জ্যাস আপত্তি করলেও আমাদের দু'জনের মতের বিরুদ্ধে তার আপত্তি টিকবে না। চোরাই সোনা আর হীরের পাঁচ আনা অংশ আমার আর পাঁচ আনা মামার, ধরতে গেলে দশ আনাই আমার, কারণ আমি ছাড়া মামার তিন কুলে কে আছে? সেই দশ আনা পাওয়া মানেও অবশ্যই কুবেরের ঐশ্বর্য পাওয়া। সেই জন্যেই কি মায়ের এ রকম আশঙ্কা!

হঠাৎ হাসিই পেল আমার। কোথায় কোন অগাধ জলের তলায় ঐশ্বর্য আর তাই নিয়ে আমার হিসেব নিকেশ আর মায়ের আশঙ্কা। বললাম, তুমি কিছু ভেবো না মা, দুনিয়ায় আমার সব থেকে বড় সম্পদ আর ঐশ্বর্য তুমি, আর কোনো ঐশ্বর্য পাই আর না পাই আমি তোমার ছেলেই থাকব।

মা অপলক চোখে খানিক আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ঠিক মনে থাকবে?

আমি হেসে মাথা ঝাঁকালাম, থাকবে।

ঠিক আছে। তাহলে মামার কথা শুনে চলো, মামা যখন যা বলবে স্থির বিশ্বাসে তাই কোরো, তার থেকে আপনার জন আর কেউ নেই এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে।

এসব কথা মা কেন বলছে ভেবে পেলাম না। মামা যে আমার কতখানি সে-কি আমি জানি না!

পরদিন যাত্রার দু'ঘণ্টা আগে আবার এক ফ্যাসাদ। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার আগেই দেখি বোম্বেটে সেজেগুজে তৈরি। সেও সঙ্গে যাবে, যাবেই। মামা প্রথমে বোঝালো, তারপর রাগ করে ধমকালো, কিন্তু বোম্বেটে নাছোড়। মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট ঘোষণা করল, হয় সে যাবে নয়তো আমরা বেরিয়ে পড়ার এক ঘণ্টার মধ্যে সে আত্মহত্যা করবে।

আমরা যাচ্ছি এরোপ্লেনে, ওর টিকিট নেই, তাছাড়া ডুবো-জাহাজে তিন জনের বেশি চারজনের জায়গা হবে না, এসব সমস্যা ও কানেও তুলল না। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে আমার, কেন মরতে এই অভিযানের প্রসঙ্গ ওর কাছে আমি ফাঁস করেছিলাম। সে এক রাতের শেষে মামার ঘর থেকে বেরুবার পরেই ওসব শোনার জন্য আমাকে ধরে পড়েছিল। তা ওকে অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না বলে ওপর ওপর একটু আধটু বলেছিলাম।

শেষে মা-ই মুশকিল আসান করল। সেই চিরাচরিত ঠাণ্ডা অথচ গম্ভীর মুখে হুকুম করল, শোন, আমার দিকে তাকা—

বোম্বেটে মুখ তুলল, এই আদেশ অমান্য করতে চেয়েও পারল না। মা বলল, আমার ছোট ছেলে কাছে থাকবে জেনে বড় ছেলেকে আমি কাজে পাঠাচ্ছি, আমার প্রতি তোর তাহলে কোনো কর্তব্য নেই? দায়িত্ব নেই?

ব্যাস। বোম্বেটে ঘায়েল।

বম্বে থেকে বি, ও, এ, সি-তে লণ্ডন যাব প্রথমে আমরা। মা আর বোম্বেটে এয়ারপোর্টে সী-অফ করতে এসেছে আমাদের। মায়ের সেই চিরাচরিত স্থির ঠাণ্ডা মুখ। সংকল্প যত বড়ই হোক, তার ভিতরটা কতখানি উদ্বেগে কাতর, বার বার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আমি অনুমান করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বার বারই আমার মনে হয়েছে, মা যেন কোনো ঐশ্বরিক শক্তির পায়ে নির্ভর করে বসে আছে। নইলে একমাত্র ছেলেকে ভয়াবহ অনিশ্চিতের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এমন স্থির আর ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারে না।

আমার কষ্ট হচ্ছিল বোম্বেটের দিকে চেয়ে। রাজ্যের বিরক্তি যেন ওর থমথমে মুখে এসে জমাট বেঁধেছে। ওকে যে-ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে সে-রকম যেন কোনো মানুষ কাউকে করে না। পিছনে আমি মা আর রঙ্গ মামা বসেছিলাম। সামনে ড্রাইভারের পাশে ও। ওর মুখখানা মামাকে দেখালাম।

সান্ত্বনার স্বরে মামা বলল, তোর কোনো ভাবনা নেইরে ব্যাটা, দিদি দু-একদিনের মধ্যে তোকে নিয়ে কলকাতা বেড়াতে যাবে।

শুনে আমি অবাক একটু। মামা হয়তো ঠাট্টাই করেছে, নইলে আমরা বেরিয়ে পড়ার পর মা বাড়ি ছেড়ে আর স্কুল ছেড়ে কোথাও যাবে ঠিক করলে আমি জানব না!

সামনের দিকে চেয়ে বোম্বেটে মাথা নেড়ে গুমগুম করে বলল, ক্যালকাটা নট্ গোইং।

বেজায় রাগ না হলে মামার মুখের ওপর এ-কথা বলার সাহস নেই ওর। দাঁত কড়মড় করে রঙ্গ মামা বলে উঠল, মায়ের অবাধ্য হয়েছিস শুনলে ফিরে এসে ব্যাটা দেব তোর মাথাটা ছাতু করে।

মা কিন্তু এবার ওর পক্ষ নিয়ে অনুযোগের সুরে তার ভাইকে বলল, যাবার আগে আবার কেন ওর পিছনে লাগিস। যখন যাব, ও আমার আগে আগে যাবে দেখিস।

এই মুহূর্তে মায়ের ওপরেই সব থেকে বেশি অভিমান বোম্বেটের। সামনে চোখ রেখেই ঘন ঘন মাথা নাড়ল বার কয়েক। অর্থাৎ কোথাও যাবে না।

কিন্তু এবারে আমি মায়ের দিকে ঘুরে তাকালাম। সত্যি কি তুমি কলকাতা যাচ্ছ নাকি মা?

মা জবাব দিল, ইচ্ছে আছে।

কই, আমি তো কিছু জানি না।

রঙ্গ মামা তড়পে উঠল, তোর অত জানার দরকার কি? দিদির ইচ্ছে শ্বশুর বাড়ির দেশটা একবার দেখে আসবে, দেখে আসুক।

মামা তুখোড় বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু আমিও নিরেট নই একেবারে।

আমরা রওনা হয়ে যাবার পর মা একদিনের মধ্যে কলকাতা চলে যাবে, এই সামান্য খবরটা আমি জানব না কেন? বাড়িতে কেউ একবারও আমাকে বলল না কেন? তাহলে কি সামান্য কিছু নয়? মায়ের কি কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা আছে?

হঠাৎ এক অজানা দুর্ভাবনায় আমার এই যাত্রার রোমাঞ্চ অনেকখানি মাটি যেন। চুপচাপ মায়ের দিকেই ঘুরে তাকালাম আবার। মা কি বুঝল কে জানে! একটিও কথা না বলে আমার একটা হাত নিজের কোলে টেনে নিয়ে সামান্য একটু চাপ দিল শুধু। অর্থাৎ আমাকে আশ্বস্ত করে বলতে চাইল, আমার জন্য কোনো ভাবনা নেই, তুই যে কাজে যাচ্ছিস, যা।

তবু ভিতরটা অস্বস্তিতে ছেয়ে থাকল আমার। বিশ বছর বাদে মায়ের হঠাৎ বিপদ কিছু হতে পারে না বুঝি। কিন্তু সামান্য কথাটা বাড়িতে মা আমাকে একবারও বলল না কেন?

এরোপ্লেনে ওঠার আগে মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। তারপর বোম্বেটেকে জড়িয়ে ধরে একটু সরে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, মা-কে দেখবি তো?

বোম্বেটের চোখে জল টলমল এখন। বিড়বিড় করে বলল, তুমি কেন ভাবছ জানি না। আমি দরকার হলে জান দিতে পারি। কিন্তু মা-কে কারো দেখতে হয় না, মা-ই আমাকে দেখবে।

বিশাল এরোপ্লেন ডানা মেলে আকাশে উড়েছে। যাত্রী বোঝাই। একদিকে দুটো করে সীট, আর একদিকে তিনটে করে।

দু'সীট-এর সারিতে আমি আর মামা পাশাপাশি বসেছি। এয়ার হোস্টেস তার প্রাথমিক কর্তব্য অর্থাৎ যাত্রীদের কাগজ জার্নাল টফি লজেন্স চা-কফি দিয়ে আপ্যায়ন শেষ করে তার জায়গায় ফিরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর ধৈর্য রাখতে না পেরে আমি জিগ্যেস করলাম, বোম্বেটেকে নিয়ে মা সত্যি কলকাতা যাচ্ছে?

মামা কাগজ পড়ায় ব্যস্ত। সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

আমি নাছোড়বান্দার মতো আবার জিগ্যেস করলাম, কেন ?

একটা হাই তুলে মামা চোখের ওপর থেকে কাগজ নামালো। সেই কাগজের আধখানা আমার কোলের ওপর পড়ল।

সেখানে কালীঘাট নামে এক জায়গায় মস্তো মন্দিরে জাগ্রত কালী আছে, পুজো-টুজো দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ইলেকট্রিক শক খেলাম যেন। কাগজের তলা দিয়ে মামার হাতের দুটো আঙুল আমার উরু থেকে খানিকটা মাংসই তুলে নিল যেন। এমন একখানা রাম চিমটি খেলে যে-কোনো লোকের মুখ যন্ত্রণায় বিবর্ণ হবে। আমারও তাই হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু এই শাস্তি কেন বোঝা মাত্র সামলে নিলাম। রঙ্গ মামার নির্বিকার মুখ, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ। একটু বাদে পিছনে মাথা রেখে ঘুমিয়েই পড়ল বুঝি।

ভিতরে ভিতরে হতভম্ব আমি। যাচ্ছি বম্বে থেকে লণ্ডনে। এখানেও এতখানি সতর্কতার প্রয়োজন কেন বুঝতে পারছি না। তাছাড়া আমরা কথা বলছি বাংলায়। পাশে বা পিছনে বাংলা বোঝার মতো কোনো যাত্রী নেই। মামা অবশ্য মুখ সেলাই করে বসে থাকার কথা বলেছিল। কিন্তু এখান থেকেই তার দরকার হবে জানব কি করে ?

আবার সেই অগোচরের চিন্তা মাথায় চেপে বসেছে। চিন্তাটা মায়ের জন্য। অপারেশন জিরোর দল এখানো কি মামার পিছনে লেগে আছে ? এই বিশ বছর পরেও ? মামা তো নিজেই বলেছিল, অনেক বছর পর্যন্ত পিছনে লেগে থাকার পর হতাশ হয়ে তারা মামার ওপর লক্ষ্য রাখা ছেড়েছে। আর সেটা ভালো করে বুঝে নিয়েই সে জ্যাসের সঙ্গে চুক্তিতে এসেছে। তাহলে এখন থেকেই মামা এত সতর্ক কেন ? আর মা-ই বা হুট করে কলকাতা চলে যাচ্ছে কেন ?

মাথাটা চিন্তায় বোঝাই হতে থাকল আমার। ঘণ্টাখানেক বাদে একবার বাথরুমে যাবার অছিলায় প্রায় সব কজন যাত্রীর মুখগুলো লক্ষ্য করলাম। সন্দেহ হবার মতো একটি মুখও চোখে পড়ল না। ভাবলাম অপারেশন জিরোর আর কোনো অস্তিত্ব থাক না থাক,

সমুদ্রের নিচের বহু কোটি টাকার অবৈধ সোনা আর হীরের সন্ধানে চলেছি আমরা, অতএব এ সম্পর্কে কোনো আলোচনার আভাসও রঙ্গ মামা বরদাস্ত করতে চায় না। তবু মায়ের কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যটা আমার কাছে একেবারে ধোঁয়াটে হয়েই থাকল।

বলতে গেলে প্রায় লণ্ডন পর্যন্ত রঙ্গ মামা ঘুমিয়েই কাটালো। কেবল খাবার এলে সজাগ হয়ে বসে। তার খাওয়ার বহর দেখে এয়ার হোস্টেসও মুখ টিপে হেসেছে। রঙ্গ মামা তাকে রঙ্গ করে বলেছে, অনেক পরিশ্রম করে এই খাওয়াটা রপ্ত করেছি, বুঝলে ম্যাডাম, হাসির ব্যাপার নয়।

আশপাশের যাত্রীরাও হেসেছে।

লণ্ডনে আমাদের কোনো নামীদামী হোটেলে ওঠার কথা। প্যাসেজ বুক করার সঙ্গে সঙ্গে মামা এই ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। কিন্তু খুঁজে খুঁজে মামা নিরিবিলি এক সাধারণ হোটেলে এসে উঠল আমাকে নিয়ে। অ্যাটেনডেন্ট আমাদের অ্যাপার্টমেণ্ট-এ পৌঁছে দিয়ে বিদায় হতে আবার আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, আমাদের না ওমুক নামজাদা হোটেলে এসে ওঠার কথা ছিল?

জবাব না দিয়ে মামা আগে ঘরটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর কিছুটা নিশ্চিন্ত সুরে জবাব দিল, কথা ছিল, কিন্তু উঠলাম না।

কেন?

বাগিং-এর ভয়ে।

বাগিং! আমি হাঁ।

মামা হাসতে লাগলো। এতবড় একটা কাণ্ড করতে বেরিয়েছিস, বাগিং জানিস না? কেউ যদি পিছু নেয়, আর কোথায় উঠছি তা যদি আগে থাকতে জানা থাকে তাহলে সেই অ্যাপার্টমেণ্ট-এ একখানা দু' আঙুলের ক্ষুদে যন্ত্র বসিয়ে রেখেই ঘরের মধ্যে আমরা কি কথা বলছি সব জেনে নিতে পারে। বাংলায় কথা বললেও লোক দিয়ে সেটা তর্জমা করে নিতে কতক্ষণ? অলক্ষ্যে এই যন্ত্র বসানোটাকে

বলে বাগিং। এই হোটেলে উঠব নিজেও জানতুম না, তাই সে ভয় নেই।

আমি বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছি।

রঙ্গ মামা হালছাড়া গলায় বলল, নে বাবা, এবারে তোর মনে যতো কথা আছে সব উজাড় করে জিগ্যেস করে ফেল। এরপর উসখুস করলে গাঁট্টা খাবি।

প্রথমেই জিগ্যেস করলাম, মা কলকাতা যাবে এ খবরটা আমরা রওনা হবার পরে বললে কেন?

মামা নির্লিপ্ত মুখ করে জবাব দিল, তোদের পুরনো ড্রাইভারটা অসুখ হয়ে পড়তে হুট করে কোত্থেকে একটা নতুন ড্রাইভার এসে জুটল, কে জানে ভিতরে কার কি মতলব, তাই একটু শুনিয়ে রাখলাম।

মা কলকাতা যাচ্ছে না তাহলে?

যাচ্ছে বইকি, তা না হলে শোনাব কেন?

কেন যাচ্ছে?

সেটা পরে বলছি। আর কি জিগ্যেস করবি?

এরোপ্লেনে অমন একখানা রামচিমটি কাটলে কেন? কেউ আমাদের ফলো করছে সন্দেহে তো?

হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। তোর শিক্ষার জন্যেও ওটুকুর দরকার হয়েছিল।

এক হোটেল বুক করে আর এক হোটেলে এসে উঠলে বাগিং-এর ভয়ে, তার মানে অপারেশন জিরোর দল এখনো তোমার পিছনে লেগে আছে ভাবছ?

এবারে রঙ্গ মামা হেসেই জবাব দিল, আমি ঠিক কিছুই ভাবছি না, কেউ পিছনে লেগে আছে কিনা সেটা জ্যাসের সঙ্গে দেখা হলে বোঝা যাবে। এখন পর্যন্ত যা করছি জ্যাসের পরামর্শ মতো করছি।

সে কোত্থেকে পরামর্শ দিচ্ছে তোমাকে?

ব্রেজিল থেকে। এ পর্যন্ত তার দুটো কোড টেলিগ্রাম পেয়েছি। একটাতে লিখেছে, কংগ্র্যাচুলেশনস, তোমার যান্ত্রিক বাজপাখির চোখ দুটো কারো কারো ভারী পছন্দ হয়েছে। তাদের কৌতূহল দেখে তোমার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে। চলে এসো।

আমি চেয়ে আছি দেখে রঙ্গ মামা হেসে বলল, বুঝলি না, একটা ডুবোজাহাজকে তো সিন্দুকে পুরে রাখা যায় না, অনেকেরই চোখ পড়তে পারে। পড়েছেও। তাদের কারো কারো কৌতূহল হয়েছে মানে সন্দেহ হয়েছে বলে ভাবছে জ্যাস। তাই বেশি সময় নষ্ট না করে চলে আসতে বলেছে।

দ্বিতীয় সাংকেতিক টেলিগ্রামে লিখেছে, কবে রওনা হচ্ছ, কোথা থেকে কোথায় হয়ে এখানে আসছ জানাও, তোমার সুবিধে অসুবিধে দেখার জন্য সব জায়গায় আমার লোক থাকবে। এর একমাত্র অর্থ, কবে আসছ বা কোথা দিয়ে কিভাবে আমরা যাচ্ছি সব যেন গোপন থাকে, সুবিধে অসুবিধে দেখার জন্য সব জায়গায় তার লোক থাকবে অর্থাৎ তার আশংকা সর্বত্র শত্রুপক্ষের চর থাকা অসম্ভব নয়। অতএব টেলিগ্রামে আমি ঘটা করে জ্যাসকে আমার যাত্রার সমাচার জানিয়েছি, তারই ইংগিতে ঠিক তার উল্টোটি করছি।

বললাম, বুঝলাম। কিন্তু কুড়ি বছর বাদেও ডক্টর জোহান এ-ভাবে খাপ পেতে আছে ?

রঙ্গ মামা জবাব দিল, ডক্টর জোহানকে আবার কোথায় পেলি তুই, সে তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে। বিশ বছর আগে 'স্ট্রীম-লাইন' ডোবার দু'মাসের মধ্যেও কেউ আর তার কোনো খবর পায়নি। অতবড় অপারেশন ব্যর্থ হবার ফলে এক মরুভূমিতে গিয়ে পালিয়ে ছিল সে। অপারেশন জিরোর দল সেখান থেকে তার হদিশ বার করে গুলি করে মেরেছে। লিসবনে থাকতে আমি কাগজে তার মৃত্যুর খবর পড়েছি।

তাহলে জ্যাসের এ-রকম সন্দেহ হল কেন ?

ঠিক বুঝছি না, লোকটা একদিকে যেমন খামখেয়ালী দরাজ আবার

রাগী মানুষ, অন্য দিকে তেমনি চতুর। কোনো কারণে হয়তো সন্দেহ হয়েছে, আবার এমনও হতে পারে এত বড় এক ব্যাপারে সব দিকে আঁট-ঘাট বেঁধে নিশ্চিন্ত হয়ে নামতে চায়। আমার পিছনে অনেক-কাল এ ভাবে লোক লেগেছিল বলেই হয়তো খুব সাবধান হওয়া দরকার ভাবছে। গেলেই সব বোঝা যাবে।

লণ্ডন থেকে যেদিন যাত্রার কথা, তার একদিন আগেই রঙ্গ মামা রওনা হবে বলে ঘোষণা করল। আমি জিগ্যেস করলাম, ব্রেজিলে জ্যাসের সঙ্গে আমার মেলামেশা কেমন হবে, মুখ সেলাই করে বসে থাকতে হবে?

রঙ্গ মামা বলল, তুই একটা আহাম্মক, আমরা মামা-ভাগ্নে দশ আনা শেয়ার নিচ্ছি বলে তোকে দেখার আগে থেকেই সে তোর ওপর ক্ষেপে আছে। তার সঙ্গেই তো সব থেকে বেশি খাতির হওয়া দরকার তোর। শোন, লোকটা দিল-খোলা হলেও সন্দেহ বাই আছে। আমরা মামা-ভাগ্নে একদিকে হওয়ার ফলে আমাদের জোরটা বেশি এ যেন কক্ষনো না ভাবে সে। আমার সঙ্গে তর্ক-টর্ক হলে তুই বরং সর্বদা ওর পক্ষ নিবি। এই লোক বিগড়লে আমাদের আর কোনো আশা নেই মনে থাকে যেন।

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, সী-হক বানানোর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পরেও বিগড়ে গিয়ে আবার থেমে যেতে পারে নাকি?

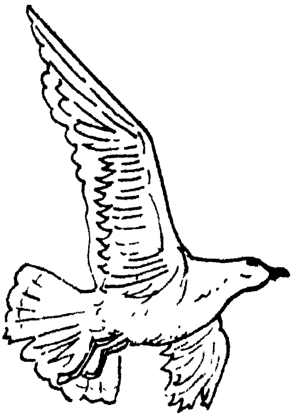
রঙ্গ মামা জবাব দিল, ভয়ানক খামখেয়ালী, সবই পারে। সোনা দানার নামে পাগল বলেই ঝুঁকি নিচ্ছে। পিছনে কি-রকম লোক লেগেছে কে জানে, এর মধ্যে ও যদি ভাবতে পারে আমরা দু'জনে ওর বিশ্বস্ত দুটো হাতের মতো, তাহলে এগোবে। নয়তো বেঁকে বসবে। ওর আর লোকসান কি, নিজের কারখানায় যে জিনিস তৈরি করেছে, তাই থেকেও ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে পারবে। তাই দায় ওর থেকে আমাদের একশ গুণ বেশি। আর একটা কথা, অহংকার না করে সর্বদা সাহসের ভাবটা বজায় রাখবি ওর সামনে। ভয়ডর

কাকে বলে এ যেন তুই জানিসই না।

আমি ঠাট্টা করলাম, খুব জানি বলছ ?

কাজের সময় দেখা যাবে। মোট কথা, জ্যাসের অবাধ্য হবি না, আবার ওর তড়পানিতে ঘাবড়ালেও চলবে না।

লণ্ডন থেকে আবার উড়ো জাহাজে রওনা হলাম আমরা। নামব ব্রেজিলের রাজধানী। রিও ডু জেনেরিওতে। মামা এরই মধ্যে আমার পোশাক-আশাকের একটু সংস্কার করে নিয়েছে। উদ্দেশ্য, দেখা মাত্র যেন বিদেশী হাঁদারাম না ভাবে কেউ। ওখানকার লোকের প্রধান ভাষা পর্তুগীজ। লণ্ডনে বসে কম করে শ'খানেক চালু শব্দ বা কথা আমার কানে ঢুকিয়েছে। বেশির ভাগ লোক নানা রকম শোলার টুপি পরে সেখানে, মামা তাও আগে থাকতেই সংগ্রহ করে রেখেছিল।



পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দেশে পা ফেললাম আমরা। সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার আধখানা জুড়ে ব্রেজিল। কিন্তু সেই অনুপাতে লোকের সংখ্যা নাম মাত্র। রোমাঞ্চ জগতের সেই আমাজনদের দেশ। দু'দিকে সমুদ্র, অ্যাটলান্টিক আর প্যাসিফিক। মাঝের বিরাট অঞ্চল জোড়া নদী, পাহাড় আর সূর্য আড়াল করা গভীর জঙ্গল। রঙ্গ মামার মুখে গল্প শুনেছি, ষোল শতকের দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীরা এই দুর্গম দেশে পাড়ি দিত, সোনা আর হীরে জহরতের খনি আবিষ্কারের লোভে। অনেকে পেয়েছে, অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখানকার জঙ্গল আজও শিকারীদের তীর্থক্ষেত্র। পৃথিবীর বিচিত্রতম সাপ আর বড় বড় পাখি থেকো বিশাল মাকড়সার সন্ধান পেতে হলে এখানে আসতে হবে। পৃথিবীর সব থেকে বড় সাপ অ্যানাকোণ্ডার সামনে পড়লে বুনো হাতি পালাবে! আর উল্টো করে গাছে ঝোলা তিন ঠেঙা ভালুক, রকমারি জাগুয়ার আর বিশাল ট্যাপির শিকারের নেশা যার তাকেও এখানেই আসতে হবে।

কিন্তু এ-যাত্রায় এই রোমাঞ্চ জগতে বিচরণের বরাত নিয়ে আসিনি আমরা। রঙ্গ মামা বলেছিল, পৃথিবীর মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারেও এমন জায়গা আর দ্বিতীয় নেই। সত্যি তাই।

পাহাড় সমুদ্র আর স্থলভূমির এমন সুচারু মিলন কল্পনা করা যায় না। এমন সুন্দর জায়গাতেও কিন্তু ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট। শহরখানা যেমন প্রাসাদে ছাওয়া, আর অঢেল বৈভব বিলাস ব্যসনের রঙ্গভূমি, দূরের পাহাড়ের দিকে আবার তেমনি সারি সারি দরিদ্র বস্তি।

এখানে আসার পর রঙ্গ মামার যেন আর কোনো তাড়া নেই। একবার শুধু জিগ্যেস করেছিলাম, জ্যাস এখানে থাকে না?

জবাবে রঙ্গ মামা যেভাবে তাকিয়েছিল, যেন গিলে খাবে আমকে। খেয়ে দেয়ে ফূর্তি করতে আর জায়গা দেখতেই যেন আসা হয়েছে এখানে।

কেউ কেউ তাকায় আমাদের দিকে। মনে হয় লক্ষ্যও করে। দুটো লোক গায়ে পড়ে জিগ্যেস করেছে, আমরা ট্যুরিস্ট কিনা। রঙ্গ মামা পরপর করে ওদের ভাষাতেই জবাব দিয়েছে, সে থাকে স্যান-টোসে। কফি ফার্মে কাজ করে, ভাগ্নে বিদেশ থেকে এসেছে, তাই তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।

খুব অবিশ্বাস করার মতো কথা নয়। পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি কফি এই ব্রেজিলেই হয়, আর তার বেশির ভাগ স্যানটোস থেকেই চালান যায়।

তিন দিন বাদে রঙ্গ মামা আমাকে নিয়ে এক শাটল এরোপ্লেনে চেপে বসল। যে জায়গায় এলাম, তার নাম ব্রাসিলিয়া। ব্রেজিলের আগের রাজধানী। তীর আঁটা ধনুকের মতো অদ্ভুত আকৃতি জায়গাটার। তেমনি সুন্দরও। রিও ডু জেনেরিও বন্দর থেকে ছ'শ মাইল পথ। মামা শুধু বলল, এ জায়গাতেই পৃথিবীর পাঁচ মিশেলি মানুষের জগা-খিচুড়ি সব থেকে বেশি। জাপান ইটালি পর্তুগীজ স্পেন, সর্ব জাতের বসবাস এখানে।

বুঝলাম, লোকের কৌতূহল এড়ানোর পক্ষে এ-জায়গাটাই সুবিধে।

জিম অ্যালবার্ট সিলভা অর্থাৎ জ্যাসের দেখা এখানে পেলাম।

সন্ধ্যার পর পরিচিত মানুষের মতোই হালকা শিস দিতে দিতে মামা মস্ত হোটেলের একটা অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির আমাকে নিয়ে। এমন কি দরজা ঠেলে ঢোকার আগে ভদ্রতাসূচক জানান দেবারও দরকার বোধ করল না।

মামার বয়সী একজন লোক গদীর সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে মোটা চুরুট টানছে। গায়ের রং তামাটে। না মোটা না রোগা, না লম্বা না বেঁটে। নাকের নিচে আর থুতনিতে খানিকটা করে লালচে গোঁফ আর লালচে দাড়ি। তার হাতে বই একটা। সামনের টেবিলে মদের গেলাস, মদের বোতল।

হ্যালো জ্যাস!

মুখ তুলল। যেন প্রত্যাশিত কাউকে দেখলো।—হ্যালো রাঙ্গা।

বই রেখে সোজা হয়ে বসলো। দু'চোখ এবার আমার দিকে। আমি তালিম দেওয়া পর্তুগীজ ভাষায় বললাম, তোমার জয় হোক।

কিন্তু অভিবাদন বা কথার কোনো প্রতি জবাব পেলাম না। মিটমিট করে দেখতে লাগল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে সুস্থে দেখল। তারপর মুখ আর চোখের ভিতর দিয়ে যেন ভিতরটাও দেখে নিতে চেষ্টা করল। তারপর টানাটানা ইংরেজিতে মামাকে বলল, এ তো দুধের বাচ্চা।

মামা এক গাল হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ, সিংহের বাচ্চা। আমাকে বলল, বোস। ওদিকের টেবিল থেকে আর একটা গেলাস এনে সেও জ্যাসের মুখোমুখি বসল। গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে দু'চুমুক খেয়ে নিলে দিব্বি। তারপর বলল, তোমার দু-একটা সেরা পালোয়ানকে ডাকো না, একটু লড়ে দেখুক।

জ্যাস আমাকেই দেখছে তখনো। কিন্তু প্রশ্নটা আমাকে। গায়ের জোর দিয়ে কি হবে, মাথার জোর কেমন?

মামা জবাব দিল, তোমার মতো বললে বেশি বলা হবে, আর আমার মতো বললে তো আকাশে তোলা হবে।

এবারে মামার দিকে ফিরে জ্যাস বলল, তুমি তো আস্ত শয়তান একখানা, এখনো ভাবছি তোমার খপ্পরে পা দেব কি না। মামার সাফ জবাব, দিও না, বাজ পাখিটিকে শুধু আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, মাল-কড়ি পেলে তোমার যা খরচ হয়েছে দিয়ে দেব।

জ্যাস আমার দিকে তাকালো। শুনলে?

আমি হেসে বললাম, মামার মুখের কথা আর মনের কথা এক নয়।

সেই জন্যই এবারে তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব। মামার দিকে না তাকিয়ে জবাব দাও।

লোকটা যে ভয়ানক চালাক সন্দেহ নেই। বেফাঁস কিছু বলে না ফেলি আমার সেই অস্বস্তি।

জ্যাস জিগ্যেস করল, তোমরা বোম্বে থেকে বেরুনোর সময় কোনো অচেনা লোক তোমাদের সঙ্গে দেখা করেছে বা আলাপ করেছে?

না।

কথাও বলেনি?

না।

চোখ বড় বড় করে মামা বলে উঠল, সে কি রে! এরোপ্লেনের সেই সুন্দরী এয়ার হোস্টেসটি কি তোর চেনা-জানা নাকি? ও মিথ্যে কথা বলছে জ্যাস, বম্বের সেই সুন্দরী এয়ার হোস্টেসকে আমি ওর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে দেখেছি। এটুকু মামার বানানো রসের কথা। জ্যাস ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, লণ্ডন থেকে তোমরা ব্রেজিল আসছ সেই এয়ার হোস্টেসকে সে-কথা বলেছ?

এবারে আমি হেসে ফেললাম। মামার এসব কথা তোমার বিশ্বাস করার দরকার নেই। আমার সঙ্গে কোনো এয়ার হোস্টেস হেসে কথা বলেনি মামার খাওয়া দেখে বরং হেসেছে আর তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়েছে।

জ্যাস জিগ্যেস করল, ব্রেজিল-এ কবে এসেছ?

কোনো নির্দেশ নেই যখন সত্যি কথা বলাই নিরাপদ। তিন দিন আগে।

রিও ড্য জেনেরিওতে কেউ তোমাদের লক্ষ্য করেছে বা কোনো অজানা লোক আলাপ করতে এসেছে?

এবারে একটু ইতস্তত করে মামার দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাস খেঁকিয়ে উঠল, আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি, মামার দিকে দেখছ কি?

মামার নির্লিপ্ত মুখ দেখেই বোঝা গেল সত্যি বলতে বাধা নেই। বললাম, মামার সঙ্গে দু-একজনকে কথা বলতে দেখেছি, ভাষা জানিনে বলে কি কথা বুঝতে পারিনি।

জ্যাস মামার দিকে ফিরল, কি কথা? রঙ্গ মামা জবাব দিল, আমরা ট্যুরিস্ট কিনা, কোথা থেকে আসছি, এই সব কথা। আমি বলেছি, স্যানটোসে কফি কারখানায় কাজ করি, আমি সেখানকার বাসিন্দা—ভাগ্নে দেশ দেখতে এসেছে। যাক, মোটা কথা শোনো, আমাদের কেউ পিছু নিয়েছে বলে আমার মনে হয়নি, লণ্ডনের বড় হোটেল ছেড়ে একটা বাজে জায়গায় উঠেছিলাম। কিন্তু তুমি ও-রকম দু-দুটো টেলিগ্রাম করলে কেন? একটু ভেবে নিয়ে জ্যাস বলল, আমাদের বাজপাখি অনেকে দেখেছে, কেউ কেউ বেশ খুঁটিয়েই দেখেছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, এ-লাইনের লোক নতুন কিছু দেখলে কৌতূহল হতেই পারে। তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েসের একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রায়ই এসে এসে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে। এটা বেচব কিনা জিগ্যেস করেছে। আর এ-রকম একটা জিনিস তৈরির পিছনে আসল মাথাটা কার তাও জিগ্যেস করেছে। কোথায় ঝাঁপ দিতে চলেছি বোঝার জন্য আমি তোমার নামটা করে দিয়েছিলাম। তার আগ্রহ তাতে অনেক গুণ বেড়ে গেল। তুমি কোথায় থাকো, কবে আসছ এখানে এসব খবরও নিতে চাইল।··· পরে আমি খবর নিয়েছি, রিওর একজন নাম করা জাহাজের

ইঞ্জিনিয়ারই বটে, কিন্তু চক্রান্তের মধ্যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার থাকতে পারে না এমন তো নয়। বিশেষ করে সে যখন তোমার নাম ঠিকানা পাবার জন্য আর তুমি কবে আসছ জানার জন্য এত আগ্রহ দেখালো। হতে পারে লোকটা ট্যালেনটেড ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়, আমার লোকেরও সেই রকমই খবর, তবু সাবধানের মার নেই।

রঙ্গ মামা জিগ্যেস করল, অপারেশন জিরোর দলের এখনো কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা সে-খবর নেবার জন্য চর লাগাতে বলেছিলাম, তার কি হল?

জনা তিনেক খুব চৌকস লোক তো লাগিয়েছিলাম, টাকাও কম খরচ করিনি, কিন্তু ঠিক ঠিক হদিস পাওয়া গেল না। অপারেশন জিরোর দল এই বিশ বছরে আর নাও থাকতে পারে, কিন্তু দলের সব লোকেরাই তো আর মরে ভূত হয়ে যায়নি বা সাধু সন্ন্যাসীও হয়ে যায়নি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্য চক্র গড়ে থাকতে পারে বা অন্য চক্রে যোগ দিতে পারে।

কাজেই নিজেদের একেবারে নিরাপদ ভাবার কোনো কারণ নেই।

রঙ্গ মামা চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। খুব ভয় করছে তোমার?

একেবারে করছে না এমন নয়। আবার এ-রকম একটা লোভ ছাড়তেও পারব না।

রঙ্গ মামা ধমকের সুরে বলল, তাহলে বাজে ভাবনা ছাড়ো, প্রাণের মায়া তোমার থেকে আমাদের কম নয়, তোমার বাজপাখির খবর শত্রুপক্ষের কানে যদি গিয়েই থাকে, তাহলে ঘরে দোর দিয়ে বসে থেকেও বিপদ এড়াতে পারবে না। এ-সব কথা বলে মাঝখান থেকে এই ছেলেটাকে ঘাবড়ে দিচ্ছ।

আমি ঘাবড়াবার পাত্র নই মামা জানে, বিশেষ করে সে যখন সঙ্গে আছে। জ্যাসকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যেই মামার এই উক্তি।

বাড়িয়ে বলেনি রঙ্গ মামা। দু'তিন দিনের মধ্যে জ্যাসকে আমারও ভালো লেগে গেল। দিলখোলা লোক, খামখেয়ালী আর রেগেও যায় অল্পেতে। কিন্তু বুদ্ধিমান সে সন্দেহ নেই। কটা দিন এখানে খাওয়া দাওয়া হৈ-চৈ আর ফুর্তির মধ্যে কেটে গেল। যেন এই করতেই এখানে আসা আমাদের।

চুপি চুপি মামাকে জিগ্যেস করেছিলাম, জ্যাসের কারখানা কোথায়? আর বাজপাখিই বা কই?

মামা বলেছে, সে কি এখানে নাকি রে বোকা, অনেক দূরে! জ্যাস শুধু আমাদের জন্য এখানে এসে আছে।

আমাদের কথাবার্তা সব ইংরেজিতে। জ্যাস প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছে, তিনজনের একজন বুঝি না এমন একটি শব্দও কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। পরস্পরের মনের যোগের জন্য এটা দরকার। ফলে রাতে শুয়ে গল্প করার সময়েও মামা ইংরেজি ছাড়া বাংলা বলে না। আমি ভুল করে দু-একটা কথা বলে ফেললে চোখ রাঙায়, এই! হেসে জ্যাসকে বলে, ওকে ফাইন করে দাও! এমনি কথায় জ্যাস আজই পাল্টা টিপ্পনী কেটেছে, ফাইন করলে তুমি মানবে সেটা? ভাগ্নের জন্যে তো পাঁচ আনা শেয়ার আদায় করে ছেড়েছ! আমার দিকে ফিরল, তুমি কি বলো, ঠিক করেছে?

আমি মন রাখা জবাবই দিলাম। মাথা নেড়ে বললাম, না এটা মামার জুলুম না স্বীকার করে পারছি না।

স্বীকার করছ? জ্যাস খুশি একটু। সত্যি সত্যি ক'আনা অংশ প্রাপ্য ভাবো তুমি?

কিছুই প্রাপ্য ভাবি না, তোমাদের সঙ্গে থাকাটাই আমার ষোল আনা লাভ।

দাঁত কড়মড় করে মামার দিকে ফিরে জ্যাস বলে উঠল, নিজের ভাগ্নের কথা শুনলে? এ ছেলের তুলনায় তুমি একটা শাইলক দি গ্রেট! সখেদে আমার উদ্দেশ্যে বলল, ভাগ বাঁটোয়ারার সময় যদি তুমি কাছে থাকতে তোমাকে কিছু ভাগ নিশ্চয় দিতাম, কিন্তু

এতটা লোকসান করতে হত না।

রঙ্গ মামা অনেকটা আমার ওপর রাগ করেই যেন বলল, ওর ভাগ থেকে কেটে নাও, আমার কোনো আপত্তি নেই!

জ্যাসও রাগত জবাব দিল, আমি এককথার মানুষ, কথা দিলে আর ফেরাই না, কিন্তু তোমার এই জুলুমবাজীর জন্য ভবিষ্যতে আর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ইচ্ছে নেই!

মামা শ্লেষ মাখিয়ে জবাব দিল, বাজ পাখি আর তার স্পেসিফিকেশন যে তোমার সম্পত্তি হয়ে গেল সেটা তো একটুও জুলুমবাজী নয়।

জ্যাস তখন বেশ মদ গিলেছে। ঘোলাটে চোখে আমার দিকে চেয়ে কড়া সুরে জিগ্যেস করল, এ-পর্যন্ত সব টাকা আমি ঢাললাম, বাজপাখির রাইট নেওয়াটা জুলুমবাজী?

বিব্রত মুখ করে জবাব দিলাম, আমি তো জানি টাকা যে ঢালে মালিকও সে-ই হয়, টাকা ঢেলে এক্সপেরিমেণ্ট করতে না পারলে কোনো ম্যাজিক প্ল্যানেরও দাম নেই।

মামার উপদেশ মতো তাকেই একটু জব্দ করতে ছাড়লাম না। রঙ্গ মামা গোলগোল চোখ করে আমার বে-আক্কেলপনা দেখতে লাগল। আর জ্যাস খুশি হয়ে দুম দুম করে আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

তারপর দিনই আবার জ্যাসকে একটু শিক্ষা দেবার সুযোগ পেলাম আমি। আমাকে দেখেই দুধের বাচ্চা বলেছিল। বিশাল একটা লেকে তিন জনে স্নানে নেমেছি। এই বিশাল লেক সাঁতরে পার হবার ইচ্ছে দেখে জ্যাস বিদ্রূপের সুরে বলল, ইণ্ডিয়ানদের কেরামতি আমার অনেক দেখা আছে, বাচ্চা ছেলে বাচ্চা ছেলের মতো থাকো, কাজ শেষ হবার আগে ডুবে-টুবে ফ্যাসাদ বাধিও না।

ইণ্ডিয়ান বলে ঠেস দিতেই আমার রক্ত গরম হয়ে গেল। রঙ্গ মামার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ইশারায় চকিত সমর্থন পেলাম।

জ্যাস গলা জলে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল। ডুব দিয়ে আচমকা ছোঁ মেরে তাকে অথৈ জলে টেনে নিয়ে গেলাম। প্রায় বিশ গজ টেনে

নেবার আগে জ্যাস বুঝতেই পারল না, জলের নিচের কোনো জন্তুটন্তু তাকে টেনে নিয়ে চলেছে কিনা। একবার ছেড়ে দিয়ে ভেসে উঠতেই হাবু-ডুবু খেয়ে সে মাথা তুলে আমাকে দেখল।

ইউ ব্লাডি সোয়াইন।

শোনা মাত্র সব ভুলে রক্ত দ্বিগুণ গরম আবার। কখনো ভেসে কখনো বা ডুব দিয়ে দূর থেকে দূরে টেনে নিয়ে চললাম তাকে। জ্যাস ভালোই সাঁতার জানে। কিল চড় ঘুষি চালাবার চেষ্টা করল, আমাকে জাপটে ধরে ওপরে চেপে বসতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিজের ইচ্ছে মতো আমাকে ছুঁতেও পারল না সে। তারপর যথার্থ ঘাবড়ে গেল। ধস্তাধস্তির চেষ্টায় হাঁপিয়ে গেছে খুব। কিন্তু আমি আর থামছি না। সে কাহিল হবার ফলে আমার টেনে নিয়ে যেতে আরো সুবিধে হচ্ছে। বিরাট লেকের অর্ধেকেরও বেশি গিয়ে ডুব দিয়ে জ্যাসের ভারী শরীরটা প্রায় শূন্যে ঠেলে তুলে ছেড়ে দিলাম। বললাম, ফেরো এবার।

বিবর্ণ দিশেহারা মূর্তি জ্যাসের। পাড়ের দিকে চেয়ে বাঁচার আশা ছেড়েই দিল বুঝি। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে, মাই গড।

এবারে আমি সদয় মুখ করে বললাম, কিছু ভয় নেই, একটুও না ফুলে তুমি শুধু ভেসে থাকো, দেখো আমি তোমাকে কেমন শোলা-খানার মতো নিয়ে যাই।

যে কথা সেই কাজ। তার হাতের নাগাল থেকে পিছনে ঘুরে দু'পায়ে তার থুতনি আটকে তর-তর করে সাঁতরে চলে এলাম। একেবারে মামার পাশে এসে ছেড়ে দিলাম তাকে।

পরিশ্রমের দরুন যতো না, ঘাবড়ে গিয়ে তার দ্বিগুণ হাঁপাচ্ছে জ্যাস। কোনোরকমে পাড়ে উঠে শুয়েই পড়ল। মামা গলা খাটো করে বলল, বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললি তুই।

আমরাও জল থেকে উঠে এলাম।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে জ্যাস সোজা হয়ে বসল। রক্তবর্ণ চোখ।

আমাকে বলল, গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব আমি।

রঙ্গ মামা বলল, দেওয়াই উচিত। কিন্তু ইণ্ডিয়ানের কেরামতিটা দেখলে তো?

যেটুকু দেখল জ্যাস তাও যেন অবিশ্বাস্য। কিন্তু আপাতত রাগ সামলাতে পারছে না। এতবড় ধনী আত্মম্ভরী মানুষের এমন হেনস্থা নিজেও যেন কল্পনা করতে পারে না। মামার দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠল, এর পরেও এই হাঙরটাকে নিয়ে আমি জলের তলায় যাব ভেবেছ?

মামার গো-বেচারা মুখ। আমার ততোধিক। নিজের কান মুলে বললাম, দেখো আঙ্কল জ্যাস, মামার সঙ্গে এ-রকম খেলা আমি বোম্বাইয়ের সমুদ্রেও করি, তোমাকে মামার মতোই ভালবেসে ফেলেছি আমি, তুমি এতটা রেগে যাবে বুঝতে পারি নি, এবারকার মতো ক্ষমা করে দাও।

শক্তি যে ধরে সে ক্ষমা চাইলে সকলেরই মন নরম হয় একটু। তবু গোঁ-গোঁ করে জ্যাস বলল, যদি সামলাতে না পারতে, যদি ডুবে যেতাম?

বললাম, তাহলে এই শরীরটাকে ব্রেজিলের বুনো পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়াতাম আমি।

জ্যাসের রাগ পড়ল। আর এর পর থেকে জ্যাসের সঙ্গে আরো বেশি খাতির হয়ে গেল আমার। মামার সঙ্গে তর্ক বাধলে আমি সর্বদাই জ্যাসের পক্ষ নিই। একদিন তো খুশি হয়ে মামার সামনেই বলল, তুমি যা ছেলে, তোমার মামার পাঁচ আনা থেকে তিন আনা কেটে নিয়ে তোমাকে আট আনা দেওয়া উচিত। এই অভিযানের পর কপালে কি আছে জানি না, কিন্তু বেঁচে থাকলে তার পরেও তোমাকে আর আমি ছাড়ছি না।

কখনো এরোপ্লেনে আর কখনো বা ট্রেনে চেপে কোথা দিয়ে কোথায় এলাম ঠিক ঠাওর করতে পারা গেল না। এখন জ্যাস গম্ভীর। মামাও তাই। আমার বুকের তলায় একটা অজানা রোমাঞ্চ।

এক জায়গায় এসে শুনলাম, সেখান থেকে আমরা স্টীম বোটে একটা মস্ত লেগুনে বেড়াতে যাচ্ছি। লেগুন বলতে চোখ-জুড়নো বিশাল হ্রদ একটা। সমুদ্রের সঙ্গে যোগ এটার। এই লেগুন শুনলাম প্রায় বিশ মাইল লম্বা আর তেমনি গভীর।

কিন্তু লেগুনে বেড়াতেই যদি যাব, স্টীম বোটে এত রসদ তোলা হল কেন? আমার মন বলছে, যাত্রার এটাই সূচনা। বড় সড় স্টীম বোটে আগে থাকতে কি-সব সরঞ্জাম তোলা হয়েছে জানি না। আমার চোখের সামনে মামা যে পরিমাণ খাবার তুলল স্টীম বোটে, সে-ও তাক লাগার মতো। এন্তার গ্রীল্ড স্টিক, চিজ, ফল, সারি-সারি প্যাক-করা টিনে তৈরি মাছ মাংস, আলুরদম, বিরিয়ানি, সুপ আরো কত কি। অত খাবার নেবার জন্য জ্যাসকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে হৃষ্ট বদনে মামা বলল, এ-সবের অর্ধেক আমার, বাকি অর্ধেক তোমাদের দু'জনের। বেশ বড় এক ট্যাঙ্ক জলও গেল সঙ্গে।

মামার চুল-চেরা তত্ত্বাবধানের পর স্টীম বোটে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সত্যি এত সুন্দর হ্রদ আর দেখি নি। দু'দিকে পাহাড়, টলটলে নীল জল ভেঙে মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি। স্টীম বোটে আরো দু'জন বাড়তি কর্মচারী আছে।

চারদিক নিরিবিলি, নির্জন। একটা নৌকোর চিহ্নও দেখলাম না কোথাও।

ঘণ্টা দুই বাদে পাহাড়ের গায়ের একটা জংলা জায়গার সামনে স্টীম বোট থামল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ডিঙিতে আরো দুটো লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

উত্তেজনায় আমার হৃৎপিণ্ড থেমে আছে যেন। আসলে জলের ওপর ভাঙা গাছপালা ফেলে জঙ্গলের মতো করা হয়েছে জায়গাটাকে। এত কাছে আসার পর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে। ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় তৈরি লম্বা হাঙরের মতো দেখতে জিনিসটা।

ডিঙিতে বসেই চারটে লোক মিলে দেখতে দেখতে গাছ-গাছড়ার

আড়াল সরিয়ে ফেলল। তারপর মোটা দড়ি দিয়ে স্টীম বোটের সঙ্গে বেঁধে ওটাকে এগিয়ে আনা হল। আরো খানিকটা গভীরে টেনে নিয়ে গিয়ে স্টীম বোট থামল।

সী-হক।

চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। আরো একটু সময় পার করে সকলে মিলে কাজে তৎপর হয়ে উঠল। স্টীম বোট আর সী-হক-এর আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে।

আমি বোটে দাঁড়িয়ে।

চারটে লোক, মামা আর জ্যাস মিলে নিঃশব্দে মোটর বোটের সমস্ত জিনিস আর সরঞ্জাম সেই ক্ষুদে সাবমেরিন-এ তুলতে লাগল। সী-হক সব মিলিয়ে চব্বিশ হাত লম্বা আর দশ হাত চওড়া আগেই শুনেছি। চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আমি শুধু বাইরেটাই দেখছি। যন্ত্রটার মাথার দিকে দু'পাশে দুটো বিরাট যান্ত্রিক হাতের মতো লাগানো। এক একটা কম করে আট-ন' হাতের মতো। পরে শুনেছি আর বুঝেছি, ও দুটো যান্ত্রিক হাতই বটে, মেকানিকাল আর্মস। ডুবোজাহাজের ভিতরে বসেই ও দুটোকে ইচ্ছেমতো অচল করা যায়। তিরিশ চল্লিশ মণ ওজনের জিনিস এই দুটো হাত অনায়াসে তুলতে পারে বা কাছে টেনে আনতে পারে, আবার এক-সের আধসের বা তার থেকেও ছোট জিনিস তেমনি সহজে ধরতে পারে। ম্যাগনেটিক আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক উপাদান ভিন্ন এটা সম্ভব নয়। সমুদ্রের নিচের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ আর পরীক্ষার জন্য এই অমিত শক্তির যান্ত্রিক হাত দরকার।

বাইরের সব কাজ সারা হতে মামা আমাকে সী-হক-এর ভিতরে নিয়ে গেল। জ্যাস তখন বাইরে তার লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলছে।

ভিতরে ঢুকেই মামাকে জিগ্যেস করলাম, এই লোক চারটেও সব জানে নাকি?

ভ্রূকুটি করে মামা প্রথমেই বলল, বাংলায় একটি কথাও নয়। তারপর জবাব দিল, ওরা জানে আমরা দূর পাল্লার মহড়া দিতে

চলেছি। ডুবোজাহাজের স্পেসিমেন গোপন রাখার জন্য এ-ভাবে চলেছি। তাছাড়া ওরা সবাই জ্যাসের খুব বিশ্বস্ত লোক।

একটু বাদে জ্যাসও এলো। ওপরের ঢাকনা ফেলে দেওয়া হল। তার পরেই শব্দ শুনে বুঝলাম স্টীম বোট চলে যাচ্ছে। ভিতর থেকে দেখলাম, বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এতটুকু ডুবো জাহাজের ভিতর দেখেও তাজ্জব আমি। কত শত রকমের যন্ত্রপাতি আর কত রকমের ব্যবস্থা, কোনটা কি কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

জ্যাসই ইঞ্জিনে গিয়ে বসল প্রথম। চাপা ঘস ঘস শব্দ শুনে বোঝা গেল স্টার্ট পড়ল। কিন্তু নড়া-চড়া নেই। মামা জানালো ইঞ্জিন গরম করা হচ্ছে।

ইঞ্জিন চালু করে জ্যাস উঠে এলো। গম্ভীর মুখে বলল, আমরা তিন জন এক আত্মা এক মন নিয়ে যাচ্ছি, এক আত্মা এক মন নিয়ে ফিরব। আর দরকার হলে কেউ কারো জন্য প্রাণ দিতেও দ্বিধা করব না।

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ মামাও ওই কথাগুলো আউড়ে গেল। তারপর আমিও। তিনজনে পরস্পরের হাত মেলালাম। জ্যাস ইঞ্জিনে ফিরে গেল। মামাকে বলল, দেরি না করে ওর ট্রেনিং শুরু করে দাও।

ডুবোজাহাজ আস্তে আস্তে ভেসে চলল এবার। ভিতরে আলো জ্বলছে। কিন্তু বাইরে নিঃসীম অন্ধকার।

মামা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল একটু। আমি আমার মা লীলা তরফদারের আশীর্বাদ ঝরা স্নিগ্ধ মুখখানা সামনে দেখতে চেষ্টা করলাম। তাকেই স্মরণ করলাম মনে মনে।

ডুবোজাহাজ অন্ধকারে জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। তার গতি বাড়ছে টের পাচ্ছি।

তৎপর হয়ে রঙ্গ মামার সাহায্যে ভিতরটা মোটামুটি বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, মামার তাগিদে

বছর দুই জাহাজেও কাজ করেছি। তবু থেকে থেকে ধোঁকা লেগে যাচ্ছে আমার।

চব্বিশ হাতের সী-হক-এর ভিতরেও তিনটে চেম্বারের মতো। সামনের দিকটা ইঞ্জিন ঘর। মাঝে আমাদের থাকার জায়গা। তারপর ওয়েট-রুম। এখান থেকে ডুবুরীর পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আর নানা রকমের সরঞ্জাম নিয়ে সেফটি-লক খুলে ভিতর থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে ভিতরে যাওয়া আসার ব্যবস্থা।

এরই মধ্যে কত রকমের কারিগরি, কত কি। জ্যাসের পাশে আর একটা বসার জায়গা আছে। কিন্তু আমার মতো আনাড়ীর চট করে সেখানে গিয়ে বসতেই সাহস হল না। সামনেটায় অসংখ্য লাল নীল সাদা কালো সরু সরু তারে আর সুইচে যেন মাকড়সার জালের মতো হয়ে আছে। কোনটাতে হাত বা গা লেগে যায় সেই ভয়। খানিক বাদেই ভিতরের তাপটুকু ভারী আরামদায়ক লাগছিল। না গরম না ঠাণ্ডা। মামা জানালো অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের প্রেসারাইজড মিকশ্চার সরবরাহ বাড়িয়ে বা কমিয়ে ভিতরের তাপ ঠিক করে নিতে হয়। এই তাপ বাড়ানো কমানোর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আছে গরম জলের শাওয়ার, দীর্ঘকাল খাবার মজুত রাখার ফ্রীজার, জলের ট্যাঙ্ক, প্রয়োজনে জল পরিশ্রুত করে নেওয়ার ব্যবস্থা, টেলিভিশন ক্যামেরা, রেডিও, সমুদ্রের নিচের ছবি তোলার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ ক্যামেরা, ম্যাপ চার্ট কম্পাস, সমুদ্রের নিচের তাপ মাপার যন্ত্র, ক্যামেরা লাগানো ১৮০ ডিগ্রি রিফ্লেকটিং মিরর। মামা সোৎসাহে সব দেখিয়ে আর বুঝিয়ে চলেছে, আর আমি বুঝি, না বুঝি মাথা নাড়ছি।

রাতের অন্ধকারে বেশ দ্রুত ছুটেছে আমাদের সী-হক। জলের ওপর দিয়েই চলেছি আমরা। হ্রদ ছাড়িয়ে বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছি বহুক্ষণ আগেই। আমার ধারণা ছিল, সকলের অগোচরে জলের তলা দিয়ে যাব আমরা। মামা বলল, দরকার হলে তাই যাব, কিন্তু বিশেষ দরকার হবে না। যে পথ ধরে চলেছি, সেদিকে

জাহাজ চলাচল নেই বললেই চলে। রাতে এতবড় সমুদ্রে আমাদের এইটুকু সী-হক কারো চোখেই পড়বে না। আর দিনের বেলায়ও অসুবিধে হবে না খুব, দু'তিন মাইলের মধ্যেও কোনো জাহাজ চললে আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়বে। তখন ডুব দিলেই হল।

শুনলাম, প্রায় চারদিন এভাবে চলার পর আমরা লক্ষ্যের জায়গাটিতে পৌঁছুব। অর্থাৎ যে জায়গায় 'স্টীম-লাইন' ডুবেছিল সেইখানে বা তার কাছাকাছি।

থাকি বোম্বাই-এ, সমুদ্রে অনেক ভেসেছি। স্টীম বোটে চেপে কতবার গোয়া গেছি এসেছি ঠিক নেই। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রার রূপ আলাদা, রোমাঞ্চ আলাদা, স্বাদ আলাদা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিচ্ছিন্ন আমরা তিনটি একাত্ম মানুষ, বিশাল সমুদ্রের ওপর একটি বিন্দুকে আশ্রয় করে কোন অজানার দিকে ছুটে চলেছি। এই ছোটার বিরতি কবে হবে বা আদৌ হবে কিনা কেউ জানে না।

রাত বারোটা পর্যন্ত বার দুই হাত বদল করে জ্যাস আর রঙ্গ মামা সী-হক চালালো। অতএব কথাবার্তা বলা বা গল্প করার ফুরসৎ কম। সেই মেজাজও এখন আর নেই যেন কারো। কাজের দায়িত্ব কাঁধে চাপলেই জ্যাস গম্ভীর হয়ে যায়। মামাও অনেকটা তাই। সকলের অগোচরে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোটাই একমাত্র চিন্তা সকলের।

রাত বারোটার পর ঘণ্টাখানেকের জন্য থেমে তিন জনে একসঙ্গে খেতে বসলাম। খাবার দেখে এতক্ষণে জ্যাসের মুখে হাসি দেখা দিল। রাতের মেনু গরম গরম মাংসের বিরিয়ানি, মাংসের স্টেক আর সালাড। জ্যাস আমার দিকে ফিরে বলল, তোমার মামা টাকা কড়ি সোনা-দানার পিছনে ছোটে কেন? যেখানে এন্তার খাবার মেলে সেখানে বসে থাকলেই তো পারে।

মামা জবাব দিল, হিসেব করে খাও, একটি দানাও ফেলবে না। কাজ সারা হবার আগে খাবার ফুরোলে তোমাকেই চিবিয়ে খাব মনে থাকে যেন, জলের তলায় আর কে দেখছে।

জ্যাস পিট পিট করে আমার দিকে তাকালো, শুনলে কথা, এই রাক্ষসটার হাত থেকে, আমাকে রক্ষা করতে পারবে না ?

আমিও হেসেই জবাব দিলাম, তা পারব বোধহয়, ও-রকম অবস্থায় পড়ার আগেই জলের তলা থেকে একটা তিমি-টিমি শিকার করে মামার সামনে এনে ফেলতে হবে। কত খাবে খাও—

খুশি হয়ে জ্যাস হাসতে লাগল। বিরিয়ানি আর মাংস ছাড়া মামা আর চোখে কিছু দেখছে না।

মামা উদার হাতে খাবার পরিবেশন করেছে বটে, কিন্তু জলের বেলায় মাপা হিসেব। শুকনো খাবার টিনের খাবার এন্তার আছে। কিন্তু জলের ট্যাঙ্ক খালি হলে অথৈ সমুদ্রে প্রাণটি খোয়াতে হবে। মামার হিসেবে সব কাজ শেষ করতে খুব বেশি হলে দশদিন লাগবে। হিসেব মতো টেনেটুনে খেলে ট্যাঙ্কের জলে বারো দিন চলবে। অতএব দিনে রাতে ছোট গেলাসের পাঁচ গেলাসের বেশি জল কেউ পাবে না। শরীর কষে না যায় এ-রকম অনেক ট্যাবলেট আর তেষ্টা দূর করার মতো অনেক রকম চিবুনোর জিনিস মামার হেপাজতে আছে। দরকার হলে তাই খাও।

খাওয়া শেষ হতে চুরুট ধরিয়ে জ্যাস লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মামাকে বলল, তুমি পাখি ছোটাও, রাত তিনটের পরে আমি।

মামা ইঞ্জিনে চলে গেল। একটু বাদে আমিও এসে সন্তর্পণে তার পাশের আসনে বসলাম। রঙ্গ মামা ইংরেজিতে জিগ্যেস করল, কি রে, কেমন লাগছে ?

আমি কিছু না ভেবেই বাংলায় বললাম, খুব ভালো, তবে থেকে থেকে মায়ের কথা মনে হচ্ছে, আচ্ছা মামা—

রঙ্গ মামা এমন কটমট করে তাকালো আমার দিকে, মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। তারপর ধমকের সুরে একটু জোর দিয়ে ইংরেজিতে গরগর করে বলে গেল, ভদ্রলোকের চুক্তি ভাঙা আমি পছন্দ করি না। জ্যাসকে একটি পর্তুগীজ কথা বলতে শুনেছিস আমার সঙ্গে ? আর খবরদার এতবড় একটা কাজে বেরিয়ে মা-মা করবি না,

পিছুটানের একটি কথাও বলবি না। এ জগতে এখন শুধু আমি তুই আর জ্যাস, এছাড়া আর কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। চিন্তার ডিসিপ্লিনও একটা বড় জিনিস, ভবিষ্যতে মনে থাকে যেন।

কি কথায় কি কথা। আমি হাঁ করে খানিক মামার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সামান্যতে এমন রেগে যেতে তাকে আর দেখি নি। কোন ধাতুতে গড়া এইসব মানুষ কে জানে। শুনেছি কাজের ভাবনায় ডুবে থাকার সময় একটি অবান্তর কথা শুনলে বাবাও আচমকা রেগে যেত। আবার সেই রাগ জল হতেও বেশি সময় লাগত না নাকি। মামাও তার এই স্বভাবখানা পেয়েছে মনে হয়।

একটু বাদে রঙ্গ মামা বলল, শুতে যা নইলে শরীর খারাপ হবে!

তুমি একলা চালাবে?

মামার একেবারে নরম মুখ এখন। বলল, একলা কোথায় রে, আমার ভিতরটা তো আনন্দে মশগুল হয়ে আছে। এতকাল বাদে তোর হতে-পারে মামীর হদিস পেতে চলেছি সমুদ্রের তলায়। তাছাড়া আমার সব থেকে প্রিয় যে-দু'জন অর্থাৎ তুই আর জ্যাস আমার সঙ্গে, আমি তো এখন স্বর্গরাজ্যে বাস করছি রে! তবে রওনা হবার পর একটা ব্যাপার নিয়ে বিবেকে একটু খচখচ করছে, বুঝলি ···।

কি ব্যাপার নিয়ে?

ওই ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপার নিয়ে জ্যাসের ওপর আমি খুব সুবিচার করিনি।·· সে না থাকলে তোর ওই হতে-পারে মামী চিরকাল সমুদ্রের তলাতেই থেকে যেত। আমি, তুই তো একই, অথচ কলে ফেলে নিজেরা দশ আনা নিয়ে তাকে ছ' আনা দিচ্ছি।

আমি হেসে ঠাট্টা করলাম, ওই কোটি কোটি টাকার সোনা হীরে তুমি হাতে পেয়েই গেছ মনে হচ্ছে?

আবার প্রায় রাগত মুখ মামার।

আলবত পেয়েছি! তোর কোনো সন্দেহ আছে?

আমি তাড়াতাড়ি সামাল দিলাম, ঠিক আছে ঠিক আছে, পেয়েছ।

তা জ্যাসকে আট আনা ভাগ দিয়ে দাও।

রঙ্গ মামা একটু ভেবে জবাব দিল, আমিও তাই ভাবছি। যে মানুষ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে আমাদের সঙ্গে এলো তার উদারতার সুযোগ নেওয়া উচিত নয়। যাক, তুই যেন ফট করে কিছু বলিস না তাকে, আমাদের করুণা ভেবে রেগেই যাবে হয়তো, আগে পাই, তারপর যা বলার আমিই বলব। আর কথা নয়, শুতে যা এখন।

দিনের বেলায় আমাদের সী-হক বেশির ভাগ সময় জলের ওপর দিয়েই ভেসে চলেছে। চারদিকে আকাশ ছোঁয়া সমুদ্র, কে দেখছে! ক্বচিৎ কখনো বহু দূরে কোথাও জাহাজ চলার সংকেত পেলে সী-হক ডুব দেয়। আর আমার শিক্ষার প্রয়োজনেও এক দেড় ঘণ্টা জলের নিচে চলে যায়।

জলের নিচে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ মামা কড়া মাস্টারের মতোই আমার শিক্ষানবিশিতে লেগে যায়। তড়িঘড়ি ডুবুরীর পোশাক আর সরঞ্জামে তৈরি হওয়া রপ্ত করেছি। গভীর জলে চলে গেলে স্কুবা গীয়ার চলবে না। ওটা পরে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট মাত্র জলের তলায় ঘোরা ফেরা করা চলে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে আমাদের চলে যেতে হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হাজার ফুট জলের নিচে। ছ'সাত মাইলের মতো। এর জন্য চাই ওপেন সারকিট স্কুবা। এর সঙ্গে থাকে খুব বেশি চাপে ভরাট, মিশ্রিত গ্যাস সিলিণ্ডার। সিলিণ্ডারের নল মুখে পরার মুখোশের সঙ্গে এঁটে নিতে হবে। সেই নলের ভিতর দিয়ে মুখোশের ভিতরে বাতাস চলাচল করবে। এ ছাড়া ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সঙ্গে থাকবে ফোম নিওপ্রিন। আর থাকবে ছুরি, কম্পাস, জল মাপার যন্ত্র, ঘড়ি, ভেসে বেড়াবার সরঞ্জাম, মুখোশের ওপর জোরালো আলো ফিট করা টর্চ, নিজেদের মধ্যে কথা বলার ব্যাটারি ট্রান্সমিটার, রাবার স্যুট, সিসের জুতো, তামার হেলমেট, আর ছোট্ট এয়ার কমপ্রেসড রিভলবার। গোলা বারুদের বন্দুক নয়, জলে বারুদ অচল। এ রিভলবারের জন্য চাই কাঁচের গুলি। বারুদের মত জলের নিচে এই এয়ার কমপ্রেসড

রিভলবারের কাঁচের গুলিরও অব্যর্থ ফল। এয়ার কমপ্রেসড বড় বন্দুকও থাকতে পারে সঙ্গে। জলের নিচে এই সব সাজ-সরঞ্জামে ডুবোজাহাজ থেকে বেরিয়ে আসা আর এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার বটে, প্রথম দিনের মহড়ার সময় প্রস্তুত হয়েই মামাকে বললাম, চলো, বেরোই।

মামা আর জ্যাস দু'জনেই হেসে উঠল। রঙ্গ মামা বলল, তুই একটা বোকার হদ্দ, সী-হক তো থেমে নেই, তুই বেরিয়ে ফিরবি কোথায়?

সত্যি লজ্জা পেয়ে গেলাম। উৎসাহের চোটে খেয়ালই ছিল না, চলতি ডুবোজাহাজ থেকে নামলে আর তার নাগাল পাওয়া যাবে না। তবে জ্যাস বা মামা আমাকে হতাশ করল না। সী-হক থামিয়ে তিন দিনের মধ্যে অনেক বারই সকলে মিলে বেরিয়ে আসা আর ফিরে যাওয়ার মহড়া দিলাম। এও এক বিচিত্র রোমাঞ্চকর ব্যাপার। যতো নিচের দিকে যাব, ততো আলো কম। আমরা কয়েকশ' ফুট মাত্র নিচে। তবু আর্কল্যাম্প বা টর্চ না জ্বালিয়ে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু তারই মধ্যে থেকে আলোর ঝিলিক। আমাদের চার দিকে অসংখ্য ছোট আর মাঝারি সামুদ্রিক জীব। তাদের গা থেকে ওই আলো ঠিকরোচ্ছে। এ রকম কিম্ভুত পোশাকের তিন মূর্তি দেখে ওরা হয়তো ভেবে পাচ্ছে না এ আবার কোন ধরনের জানোয়ার। ওদের শান্তির ব্যাঘাত ঘটেছে। যতো বেশি ছোটাছুটি করছে ওদের গা থেকে ততো আলো ঠিকরোচ্ছে।

রঙ্গ মামা আর জ্যাসের দু'জনারই থমথমে মুখ। এই প্রথম দু'জনার মধ্যে সত্যিকারের একটু ঝগড়া হয়ে গেল। টর্চ ম্যাপ আর বাবার দেওয়া সেই নকসা মিলিয়ে মামা নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে পৌঁছেছে। বিকেল তখন ছ'টা।

হিসেবের ঘণ্টা পাঁচেক আগে এসে পৌঁছেছি আমরা এখানে। সেটাও রঙ্গ মামার বাহাদুরি। তার হাতে পড়লে সী-হক জোরে ছোটে। আগে ঠিক ছিল রাত এগারোটায় লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁছুলে

ঘণ্টা আড়াই তিন বিশ্রামের পর রাত দুটো নাগাদ সী-হক সাগরতলে রওনা হবে। অনুমান ছত্রিশ হাজার ফুট অর্থাৎ প্রায় সাত মাইলের মতো নিচে নামলে আমরা সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছব। আমাদের সময় লাগবে কম করে পাঁচ ঘণ্টা। তার মানে সকাল সাতটা নাগাদ সী-হক সমুদ্রের তলার মাটিতে নোঙর করবে। মামার হিসেবে বিশ বছর আগের সেই বিধ্বস্ত 'স্টীম-লাইন' জাহাজ খুঁজে পেতে হলে খুব বেশি হলে ঘণ্টা দুই সময় লাগতে পারে। সকাল ন'টা আন্দাজ আমরা সেই বিপুল ভাণ্ডার উদ্ধারের কাজে লেগে যেতে পারব। হিসেবে ভুল না হলে সেই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে বেলা বারোটার মধ্যে আমরা সমুদ্রের তলা থেকে ওপরে রওনা হবো। এমনিতে নামার থেকে উঠতে ঢের কম সময় লাগে। কিন্তু সঙ্গের সোনা আর হীরের বাক্স উঠলে ওজন বাড়ার দরুন ওপরে ভেসে উঠতে সময় কিছু লাগবে। কত বেশি মামা সেটা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে নি। তবু ধারণা বিকেল চারটের মধ্যে সী-হক আবার জলের ওপরে উঠে আসবে। তারপর আর না থেমে সী-হক সোজা রওনা হবে ব্রেজিলের সেই নির্জন লেগুনের দিকে। সেখানে পৌঁছলে পরের যা-কিছু ব্যবস্থা এবং কর্তৃত্ব সব জ্যাসের।

কিন্তু সাড়ে তিন দিনের পথ ভেঙে ঘণ্টা পাঁচেক আগে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুনোর দরুন মামার জেদের ফলে এই ছক-বাঁধা হিসেবের রকম-ফের হয়ে গেল। মামা ঘোষণা করল, রাত এগারোটার জায়গায় বিকেল ছ'টার মধ্যে যখন পৌঁছেই গেছি তখন আর রাত দুটো পর্যন্ত ডুব দেবার জন্য অপেক্ষা করব কেন, ঘণ্টা দুই-আড়াই বিশ্রাম করে রাত ন'টার আগে আমরা নিচের দিকে ছুটব।

জ্যাসের খুব পছন্দ হল না, বলল, তোমার হিসেব ঠিক থাকলে আমরা তাহলে রাত দুটোয় সমুদ্রের তলায় পৌঁছুব ?

মামা বলল, 'হ্যাঁ, তাতে কি ?

জ্যাস মাথা নাড়ল, রাতে কাজ নেই, সকালে হাজির হওয়াই ভালো।

মামা হেসেই মন্তব্য করল, তুমি একটা বুদ্ধু, সমুদ্রের তলায় চলে গেলে রাত আর দিন সমান অন্ধকার, আমাদের টর্চ আর সী হকের ফ্লাড লাইট ভরসা। হিসেবের বাইরে কত কি হতে পারে, হাতে পেয়েছি যখন পাঁচ ঘণ্টা সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

কিন্তু জ্যাসের আপত্তি। সে তবু মাথা নেড়ে বলল, তোমার হিসেব এগোয় তো পিছিয়ে পড়ে না। আমি ভয়ানক ক্লান্ত, এখন টানা ঘুম দেব, সী-হকেরও বিশ্রাম দরকার। ওই রাত দুটোতে বলেছিলে ঘড়ি ধরে ঠিক ওই সময়েই ঈশ্বরের নাম নিয়ে ডুব দেব।

এই সামান্য কথায় মামা কেন যে হঠাৎ এমন চটে গেল ভেবে পেলাম না।

ক্লান্ত সত্যি আমিও। উত্তেজনায়ও তো এক ধরণের ক্লান্তি আছে। তিরিক্ষি মেজাজে মামা বলে উঠল, সী-হকের আসল পাইলট এখন আমি, সার্ভিসে থাকলে এটুকু অবাধ্যতার জন্যেই তুমি কি শাস্তি পেতে জানো না! সী-হকের কতটা বিশ্রাম দরকার সেটা তোমার থেকে আমার ভালো যাচাই করা আছে। সমুদ্রের সবকিছু অনিশ্চয়তার মধ্যে পাঁচটা ঘণ্টা সময় হাতে পাওয়া কি ব্যাপার তোমার নিরেট মাথায় সেটা ঢুকবে না। তোমার বিশ্রাম দরকার তো পড়ে ঘুমোও গে যাও, সমুদ্রের তলায় পৌঁছে সী-হক নোঙর করে তারপর তোমাকে ডাকব'খন। কিন্তু আমার ওপর সর্দারি করতে এলে এরপর এক ঘুষিতে তোমার নাক থ্যাবড়া করে দেব বলে দিলাম।

অপমানে মুখ লাল জ্যাসের। এতবড় ধনী ব্যবসায়ীর এ-রকম কথা শুনলে অপমান হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জ্যাস মামার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর পরিস্থিতি বুঝে বুদ্ধিমানের মতোই রাগ সামলে নিল। আমার দিকে ফিরে আহত সুরে বলল, শুনলে কথা, ঐশ্বর্য হাতে আসার আগেই এই মেজাজ, এলে পরে কি হবে?

তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য সহানুভূতির সুরেই মামাকে ঠেস দিয়ে

বললাম, কাজের আওতায় ঢুকলেই ডাকসাইটে পাইলটরা ডিসিপ্লিনের নামে এই মেজাজ দেখিয়ে থাকে, প্রায় বিনা কারণে আমিও এরই মধ্যে একদিন মামার রামধমক খেয়েছিলাম, তুমি কিছু মনে কোরো না।

তবু একটু রাগ না দেখালে মান থাকে না। জ্যাস গোঁ-গোঁ করে ভিতরে চলে গেল। হয় শোবার ঘরে নয়তো ওয়েট রুমে গিয়ে বসেছে। মামা ভুরু কুঁচকে নিবিষ্ট মনে ইঞ্জিন চেম্বারের সমস্ত যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। আমার এত হাসি-খুশি রঙ্গ মামার এই কর্মতৎপর রুক্ষ-গাম্ভীর্যও যেন দেখার মতোই।

কিন্তু অভিযানের এমন একটা স্তব্ধ সময়ে জ্যাসই বা কতক্ষণ তফাতে বসে থাকতে পারবে। খানিক বাদেই সে আবার বেরিয়ে এসে মামার সঙ্গে তদারকিতে যোগ দিল। কাজের গুরুত্ব আমার থেকে অন্তত ঢের বেশি বোঝে সে। একটা স্তব্ধ উত্তেজনা সকলের চোখে-মুখে জমাট বাঁধছে ক্রমশ।

আহারাদি সেরে রাত ঠিক ন'টায় সী-হক জলের তলায় ডুব দিল। পাইলটের সীটে মামা, তার পাশের আসনে জ্যাস। আমি ভিউপোর্ট বা পোর্ট হোল দিয়ে জলের তলার দৃশ্য দেখছি। কখনো বা উঠে এসে জ্যাস আর মামার পিছনে হুমড়ি খেয়ে ডেপথ মিটার দেখছি, আর সামনের ভিউপোর্ট দিয়ে সামনের দিকে নজর রাখছি। স্তব্ধ উত্তেজনায় আমার বুকের ধুকধুকুনিও থেমে আছে যেন।

পৃথিবীর শতেক ভাগের উনত্রিশ ভাগ মাত্র ডাঙা। বাদবাকি সব জল। সেই মহাজলভাগের এক অজানা গভীরের দিকে চলেছি আমরা। গোড়ার দিকে সী-হক আড়াআড়িভাবে চলেছে মনে হল। সমুদ্রের গভীরতার হিসেবে কিছু জটিলতা আছে বলেই বোধহয়। তীর থেকে হিসেব করলে প্রায় দশ মাইল তফাতে এলে প্রায় একশ নিরানব্বুই মাইল পর্যন্ত তার গভীরতা ক্রমশ পাঁচশ সত্তর পর্যন্ত নেমে আসে। একশ বিরানব্বুই মাইলের পরেই সেই গভীরতা দ্রুত নেমে আসে পাঁচশ সত্তর ফুট থেকে প্রায় এগারো হাজার চারশ

ফুটে। আমরা অবশ্য তীর থেকে দেড়শ মাইলের অনেক গুণ দূর দিয়েই নামতে শুরু করেছি। তবু গভীরতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য কি কোনো ডুবন্ত পাহাড়ের গায়ে ঠোক্কর খাবার ভয়ে আড়াআড়ি ডুবে চলল সী হক, জানি না। কিন্তু এসময় কিছু জিগ্যেস করতে গেলে দাবড়ানি খেতে হবে।

লক্ষ্য করলাম, সেকেণ্ডে তিন ফুট হিসেবে নিচে নামছে সী-হক। এটাই নিয়ম। তলদেশের চার হাজার ফুটের মধ্যে সেকেণ্ডে দু'ফুট করে নামবে। আর শেষ ছ'শ ফুটের মধ্যে এসে সেকেণ্ডে একফুট করে নামবে। নইলে সমুদ্রের তলার মাটিতে যন্ত্রযান ঘা খাবে। কিন্তু সেই শেষের কথা এখনো কল্পনাও করা যাচ্ছে না।

…ছ' সাত মিনিটে সবে এগারো শ' ফুট এসেছি, হঠাৎ দেখি সী-হকের ফ্লাড লাইট থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। সর্বনাশ! আলো বিগড়লো? জ্যাসও সভয়ে তাকালো মামার দিকে।

রঙ্গ মামা বলল, আমাদের সী-হককে কারা আক্রমণ করেছে। ওই দেখো ওগুলোর নাম স্কুইড। অক্টোপাস জাতীয় দশ বাহুর জানোয়ার। লম্বায় এক ফুটের বেশি হবে না। মামা বলল, জায়েণ্ট স্কুইড ষাট ফুট লম্বাও হতে পারে, কিন্তু সেরকম স্কুইড অ্যাটলান্টিকে নেই।

চারদিক থেকে ওগুলো এমন ভাবে ছেঁকে ধরছে আমাদের যে গতি কমতে বাধ্য। পাম্প করার মতো গলা দিয়ে তীব্র বেগে কালি ছিটোয় এগুলো। এটাই ওদের আক্রমণের ধারা। সত্যিকারের কালির মতোই কালো তরল পদার্থ ছিটকে বেরুতে থাকে। একসঙ্গে একশ-দেড়শ স্কুইড এই কাণ্ড করছে। তাইতেই ফ্লাড লাইটের জোরালো আলো ক্ষণে ক্ষণে কালচে হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, ওদের কাটিয়ে আরো কিছুটা নিচে চলে এলাম। তেরো শ' ফুট হবে। এবার আমরা যে হাজার হাজার রকমারি জীবের পাল্লায় পড়লাম, সেগুলোর নাম শুনলাম ল্যানটার্ন ফিস। তিন থেকে ছ' ইঞ্চি লম্বা হবে। কত রকমের যে রং ওদের ঠিক

নেই। কিন্তু এই ঝাঁকে ঝাঁকে ল্যানটার্ন ফিসের আক্রমণের নয়, পালানোর তাড়া। সেও এক দৃশ্য। বড় বড় চোখ, কোনটার আবার মাথার ওপর জ্বলছে।

আঠের শ' ফুট নিচে আবার আর এক দৃশ্য। মোটা বিশাল একটা কেবল, অর্থাৎ আড়াআড়ি পড়ে আছে। টেলিফোন কোম্পানীর কোনো পরিত্যক্ত প্রচেষ্টার নজির হয়তো। ওই কেবল-এ ঝুলে আছে রাশি রাশি ওগুলো কি? মামা ওই কেবল-এর পাশ ঘেঁষেই সী-হককে নামিয়ে নিয়ে গেল।

চিংড়ি মাছ। এমন দানবাকৃতি চিংড়ি কল্পনা করা যায় না। আকারে দু হাতের কম নয় আর ওজন বোধহয় পাঁচ কিলো করে হবে এক একটার। ওই কেবল-এর যত দূর চোখ যায়, শয়ে শয়ে চিংড়ি মাছ ঝুলে আছে।

আমি আর জ্যাস হঠাৎ অবাক একটু। সী-হক প্রায় থেমে গেছে। মামা কি কল টিপল কে জানে! সী-হকের যান্ত্রিক বাহু ওই তারের দিকে এগুলো, তারপর অনায়াসে বড় সড় একখানা চিংড়ি মাছ তুলে নিয়ে এলো। যান্ত্রিক হাতের চাপ বাড়াতে চিংড়িটা বিশাল ঠ্যাঙ নেড়ে চেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

জ্যাস রেগে গিয়ে বলে উঠল, এখন তোমার চিংড়ি খাবার সময়?

মামা নির্লিপ্ত গম্ভীর। আমাকে হুকুম করল, ওয়েট রুমের দরজার মুখ থেকে ওটা নামিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেটে কুটে ফ্রীজে রেখে আয়। ফেরার সময় কার কেমন চলে দেখা যাবে।

বাইরের জিনিস ভেতরে নেবার যান্ত্রিক ব্যবস্থাও আছে। অসুবিধে কিছু নেই। ছোট বড় কত রকমের জীব যে দেখতে দেখতে চলেছি, তার হিসেব নেই। মামা বলল, গবেষণায় এখন পর্যন্ত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সামুদ্রিক জীবের হদিস মিলেছে আর ফি বছর আটশ থেকে হাজার রকমের নতুন জীব আবিষ্কার করা হচ্ছে।

পঁচিশ মিনিটে চার হাজার ফুট নেমেছি। হঠাৎ চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছায়া নামল মামার। জ্যাসেরও আতঙ্কিত মুখ। আমি ভালো করে তাকালাম পিছন থেকে। সামনে বিশাল কালো মেঘের মতো ওটা কি? ধীরে ধীরে ওটা এদিকেই এগিয়ে আসছে!

এটুকু সময়ের মধ্যে ভয়াবহ জীবও কিছু দেখেছি। দশ সাড়ে দশ ফুটের ব্ল্যাক মারলিন, তেরো সাড়ে তেরো ফুটের ব্লু মারলিন, দশ ফুটের টারপন, আট সাড়ে আট ফুটের ব্যারিকুড়া। মামা চিনিয়েছে, আর দেখামাত্র সম্ভাব্য মাপ আর ওজনও বলে দিয়েছে। কিন্তু ভাসমান মেঘের মতো এই জানোয়ারটা কে? কম করে চল্লিশ পঁয়-তাল্লিশ ফুট হবে লম্বা! অস্ফুট স্বরে মামা বলে উঠল, সর্বনাশ, হোয়েল শার্ক।

ফ্লাড লাইটের জোরালো ঝাপটা খেয়ে জানোয়ারটা থমকে থেমেছে। এই যানটা কোন ধরনের জনোয়ার ভাবছে হয়তো। আমরা অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জানোয়ারটার জ্বলন্ত দুই চোখ বড় বড় দুটো ডিনার প্লেটের মতো। ভয়াল দাঁতের সারির আভাস শুধু দেখলাম একবার। ওটা এত কাছে এখন যে আক্রমণ করলে কি হবে ভেবে পেলাম না। স্টীল অ্যালয়ের তৈরি যানের ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তোলপাড় করলে যন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে, যান্ত্রিক বাহু দুটো অন্তত নষ্ট হতেই পারে।

জ্যাস তাড়া দিল, যতো জোরে পারো নিচে নামো না! দাঁড়িয়ে গেলে কেন?

রঞ্জ মামা ওটার দিকে চোখ রেখে বলল, নড়াচড়া করলেই ওটা ক্ষেপে যাবে, চুপচাপ বসে দেখো।

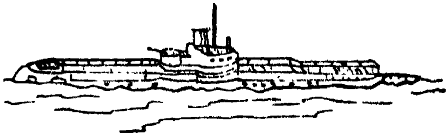
আবার ওটা আস্তে আস্তে কাছে আসছে।

আমার গায়ের রক্ত শিরশির করে পা বেয়ে নামছে যেন। সী-হকের একেবারে গা ঘেঁষে স্থির হল ওটা। ভিউপোর্ট দিয়ে আমরা দানবটার সর্বাঙ্গ দেখছি। ওটা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। ভিতর থেকে দেখা যায়, বাইরে থেকে দেখা যায় না। সী-হকের গায়ে মুখ

ঠেকালো একবার। তারপর আস্তে আস্তে চারদিকে পাক খেল একটা। শেষে ধীরে সুস্থে চলে গেল। একটা বিশাল ভয়াল জমাট বাঁধা মেঘ সরে গেল।

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জ্যাসও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আবার ইঞ্জিন চালু করে রঙ্গ মামা বলল, ১৯১২ সালে যে হোয়েল শার্ক ধরা-পড়েছিল, লম্বায় সেটা ছিল আটত্রিশ ফুট, আর ওজন ছিল ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ চুরানব্বই পাউণ্ড। এটা তার থেকে বড় তো হবেই।



আমরা চলেছি তো চলেইছি। ঘড়ি দেখলাম। মাত্র এগারোটা রাত। অর্থাৎ দু' ঘণ্টা আগে মাত্র যাত্রা করেছি। অথচ মনে হচ্ছে, কত দীর্ঘ সময় যেন চলে গেছে। জায়গায় জায়গায় বাধা পাওয়ার দরুন সাড়ে ষোল হাজার ফুট নিচে এখন আমরা। এখনো সেকেণ্ডে তিন ফুট বেগেই নামছে সী-হক।

কড়া দিনের আলোতেও দশ হাজার পাঁচশ' ফুট নিচে নামলেই গাঢ় অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের রূপ দেখাবার জন্যেই বোধহয় রঙ্গ মামা ফ্লাড লাইট নিভিয়ে দিল। এখানে জলজ জীবের উৎপাত নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে মেরুদণ্ডহীন ছোট ছোট জীব দেখা যাচ্ছে। চারদিক নিথর-নিস্তব্ধ। হঠাৎ কেমন অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তিনটি মানুষ যেন বিচ্ছিন্ন, নিদারুণ একলা। এক-একটা ক্ষুদ্র অণুর মতো আমরা এক মহাশূন্যের গহ্বরে নেমে চলেছি। জলের তলার সব কিছু কবরের মতো শান্ত স্তব্ধ।

রঙ্গ মামা ফ্লাড লাইট জ্বালতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

চলেছি। আমাদের মুখের কথা কমে আসছে। কাছে দূরের অনেক পাহাড়ও চোখে পড়ছে। শুনেছি, হিমালয়ের থেকেও বড় এক-একটা ডুবন্ত পাহাড়। কত যুগ ধরে এগুলো যেন লোকচক্ষুর আড়ালে তপস্যারত।

এই স্তব্ধতার মধ্যে কতকাল ধরে ডুবে আছি আমরা? ঘড়ি দেখলাম। মাত্র চার ঘণ্টা। এখন একত্রিশ হাজার ফুট জলের নিচে আমরা। মামা কিছু গতি কমিয়ে থাকবে। তার হিসেবে

আর পাঁচ হাজার ফুট বাকি।

ভিতরের বাতাস হঠাৎ অস্বস্তিকর লাগছে কেমন। সকলেরই। মামা জ্যাসকে হুকুম করল, লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড চালিয়ে দাও। কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেছে! জ্যাস হুকুম তামিল করার দু' তিন মিনিটের মধ্যে আবার সুস্থ বোধ করলাম।

...সী-হকের গতি এখন সেকেণ্ডে দু' ফুটেরও কম। মনে হচ্ছে, শরীরের রক্ত চলাচলও থেমে আছে এখন। আরো চার হাজার অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ হাজার ফুটেরও কিছু নিচে আমরা। না, মামার ভুল হয় নি। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সমুদ্রের তলার মাটি ছোঁব। সমস্ত রকমের বাধা বিঘ্ন ধরেই রঙ্গ মামার হিসেব।

এবারে সেকেণ্ডে এক ফুট করে নামছি। ইকো সাউণ্ডার দিয়ে পরীক্ষা করে রঙ্গ মামা একটু আগেই বলল, পুরো ছত্রিশ হাজার ফুট নামতে হবে না, তার থেকে শ'তিনেক ফুট কম হবে জলের গভীরতা। একটা উন্মুখ প্রতীক্ষায় স্তব্ধ আমরা।

মামার ঠাণ্ডা গলা কানে আসতে চমক ভাঙল যেন। রঙ্গ মামা বলল, আর পনের ফুট নিচে মাটি।

সী-হক সেখানেই নিশ্চল দাঁড়াল খানিক। রঙ্গ মামা ফ্লাড লাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখে জোরালো একটা কাঁচের যন্ত্র লাগিয়ে চারদিক দেখতে লাগল।

আর নিচের দিকে নয়, সী-হক এবার সমান লেভেলে মোটরিং করে চারদিক ঘুরতে লাগল। তার পাশে জ্যাস ভিউপোর্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টা তল্লাসির পর এক জায়গায় সী-হকের গতি আরো শিথিল হতে জ্যাস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওই-ওই সামনে ওটা কি?

চোখে আবার সেই কাঁচা লাগিয়ে মামা দেখতে লাগল। তারপর বলল, ওটাই। আমার বুকের তলায় যেন হাতুড়ি পিটছে কেউ।

ধীরে ধীরে সী-হক ওদিকে এগিয়ে চলল। একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর খুব আস্তে আস্তে নিচে নামতে লাগল। পাঁচ

ফুট বাকি থাকতে ভিতর থেকে দুটো পায়ের মতো নামিয়ে দেওয়া হল। সী-হক এরই ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াবে, বাইরের কাঠামো মাটি স্পর্শ করবে না।

দাঁড়াল।

আমাদের পাশে জাহাজের কঙ্কাল একটা। ওটার অবয়বের কাঠ আর নরম জিনিস যা-কিছু সব বিশ বছরের নোনা জলে পচে ক্ষয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিশ হাজার টনের 'স্টীম-লাইনের' ইস্পাতের বাঁধাই নিচের দিকটা জং ধরা লোহা তারের জাল আর বড় বড় চিমনি-সহ একটা বিশাল কাঠামো শুধু পড়ে আছে।

এটুকু দেখেও একটা অনুভূতির তোলপাড় শুরু হল বুকের তলায়। একদিন বাবার হুকুমে এই জাহাজ চলত, ঘুরত ফিরত। এই জাহাজের সর্বত্র বাবা ঘুরে বেড়াতো। বিশ বছর বাদে আমি সেটাই দেখছি, সেটার স্পর্শ পেতে চলেছি।

মুখে একটিও কথা না বলে ওয়েট রুমে এসে আমরা তড়িঘড়ি সাজসজ্জা করে নিলাম। তারপর বেরিয়ে এসে একে একে সমুদ্রের তলার মাটিতে পা ফেললাম। প্রথমে রঙ্গ মামা, তারপর জ্যাস, পিছনে আমি।

জাহাজের ভাঙা দিকটা নিচে পড়েছে। ও-দিক থেকে বেয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে উঠে আসাটা আমাদের পক্ষে সহজেই হল। স্টংরুমটা লোহার, আগাগোড়া জং ধরা একটা লোহার স্তূপের মতো পড়ে আছে। আমাদের তিন জনের মাথায় তিনটে অটোমেটিক জোরালো লাইট জ্বলছে, হাতেও টর্চ। চার দিকে তাকিয়ে রঙ্গ মামা সেই সিক্রেট চেম্বার বা গোপন কুঠুরি খুঁজছে। যেখানে সুটকেসের মতো হাতল-অলা আটটা বাক্সে অপারেশন জিরোর বিপুল চোরাই ঐশ্বর্য বিশ বছর ধরে ঘুমোচ্ছে। আর আছে বৈধ-চালানের সোনা আর মোহরের কেস।

খুঁজতে হল না। অদূরে আর একটা ছোট স্তূপের মতো কি। টর্চের আলো পড়তে চকচক করে উঠল। ওটাই ইস্পাতের তৈরি

সিক্রেট চেম্বার। ভিতরটা প্রেসারাইজড। অতি গোপনীয় সরকারি দলিল পত্র আর সম্পদ নিরাপদ রাখার জন্যে এই সিক্রেট চেম্বার। জাহাজ ডুবি হলে বা ভেঙে চৌচির হলেও এর ভিতরের জিনিস যাতে নষ্ট না হয়, সেই রকম পাকা পোক্ত ব্যবস্থা।

এর দরজা এমনিতে খুলবে না। কিন্তু রঙ্গ মামা সর্বরকম সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত। পোশাকের ভিতর থেকে কি একটা বার করল। তার পরেই তার উদ্দেশ্য বোঝা গেল। বসে রুবি লেসারের আলো দিয়ে ইস্পাতের দরজা একেবারে তলার দিক কেটে টেনিস বলের মতো একটা ফুটো করল প্রথমে। একেবারে দরজা কেটে দিলে আমাদের সুদ্ধু নিয়ে ওই শূন্য ঘরে এমন তোড়ে জল ঢুকবে যে কারো রক্ষা থাকবে না। মাথার ওপর জলের চাপ তো প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দু'লক্ষ পাউণ্ড।

একেবারে মেঝে ঘেঁষে দরজা অল্প ফুটো করার ফলে তলা থেকে ওই চেম্বার জলে ভরাট হয়ে যাবে। তখন ভিতরের চাপ আর বাইরের চাপ সমান। দরজা কেটে দিলেও তখন এই রকমই শান্ত থাকবে ওই জলে ভরাট স্টিল চেম্বার।

মিনিট তিনেকের বেশি সময় লাগল না। রঙ্গ মামা ফুটো দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দেখল ভিতরে আর জল যাচ্ছে না। অর্থাৎ ওই চেম্বারের ভিতরের অবস্থা এখন বাইরের মতোই।

রুবি লেসার দিয়ে এবারে দরজা কাটা হল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

এইটুকু জায়গায় তিন জনের মাথার জোরালো আলোর ঘায়ে ঘরটা ঝলমল করে উঠল।

সামনের স্টিলের দেওয়াল ঘেঁষে দু'থাকে সেই আটটা বাক্স সাজানো।

তার পাশে আরো গোটা কতক ছোট ছোট কেস।

এক নজর দেখেই সেই কিম্ভূত পোশাক পরা অবস্থাতে রঙ্গ মামা বোধহয় উৎকট আনন্দে জ্যাসকে দু'হাতে জাপটে ধরল।

পরের মুহূর্তে আমি হতচকিত একেবারে। জ্যাস রঙ্গ মামার গায়ের ওপর ঢলে পড়েছে কেন? আনন্দে অজ্ঞান হয়ে গেল?

মামা তাকে ঠেলে দিতেই সে চিৎ হয়ে গেল।

কিন্তু মুখোশের ভিতর দিয়ে এ কি দেখছি আমি। আচমকা কোনো ভয়াল দুঃস্বপ্ন?

ঘরের শান্ত জল রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। রঙ্গ মামার হাতে এয়ার কমপ্রেসড রিভলবার।

আমি দেখছি। কাঁপছি। স্বপ্ন নয়। রাবারের ফুটো বিদীর্ণ করে জ্যাসের বুক আর পেটের চার জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্তে জল লাল হয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে এসে এক টানে জ্যাসের মুখোশ খুলে ফেলল রঙ্গ মামা। তার জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা কিছু যেন টেনে ছিঁড়ে নিয়ে এলো।

মুখোশ খোলা হতেই আমার দৃষ্টি জ্যাসের মুখের দিকে। জ্যাস চোখ চেয়ে আছে। যেন অবাক বিস্ময়ে আমাদের দেখছে।

এ কি হল! এ কি করল রঙ্গ মামা?

চোখের নিমেষে মামা একে একে ওই আটটা বাক্স দরজার বাইরে নিয়ে এলো। টান দিয়ে আমার অবশ দেহটাকে ঠেলে বার করতে চাইল।

আমি তখনো জ্যাসকে দেখছি। রঙ্গ মামা তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। জ্যাস চেয়ে আছে। আমাদের দেখছে।

আমরা বেরিয়ে এলাম।

জ্যাস ওখানেই চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকল।

আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। গা গুলোচ্ছে। সর্বাঙ্গ অবশ। কি হয়ে গেল, কেন হয়ে গেল, আমি এখনো ভাবতে পারছি না।

এই বিপুল ঐশ্বর্য দেখেই মামার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এত বড় বন্ধুর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল?

জলের নিচে ভারী জিনিসও হালকা। বাক্সগুলোর হ্যাণ্ডেল

একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল রঙ্গ মামা। তারপর দড়ির দু'মাথা দুজনে ধরে অনায়াসেই সেগুলো টেনে নিয়ে সী-হকের ওয়েট চেম্বারে তুলে দেওয়া হল। তখনো যেন চেতনা ফেরেনি আমার।

ওয়েট চেম্বারে ঢুকে মামা খানিকটা জল কমিয়ে মুখোশ খুলল। নিজের অগোচরে আমিও।

রঙ্গ মামা তাকালো আমার দিকে। থমথমে মুখ।

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, এ কি করলে তুমি রঙ্গ মামা?

দাঁতে দাঁত চেপে এই প্রথম বাংলায় আর কঠিন গলায় রঙ্গ মামা বলল, এখন একটি কথা নয়, শুধু জেনে রাখ, দাদাজীর মৃত্যুর খানিকটা প্রতিশোধ এতদিনে নেওয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত।

এবারে আর মামা আমাকে নিল না। একলাই জাহাজে ফিরে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সিক্রেট চেম্বার থেকে বৈধ চালানের সোনার বার আর মোহরের কেস ক'টা উদ্ধার করে ফিরে এলো।

ঘড়িতে তখন সকাল পাঁচটা।

ওয়েট রুমের দরজা বন্ধ করে আর সুইচ টিপে জল নিকাশ করে আমাকে নিয়ে মামা ভিতরের চেম্বারে এলো। পোশাক-পরিচ্ছদ আর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে বাক্সগুলোও ওখানে পড়ে থাকল।

এতদিনের অভ্যাসের ফলে আমি ইংরেজিতেই বলে উঠলাম, আর আমি পারছি না চুপ করে থাকতে, এ কি হল মামা? এ কি করলে তুমি?

জ্যাস শত্রু এ আমি তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

মামার এতদিনে আবার সেই চিরাচরিত নিরীহ মূর্তি। বলল, আর তোকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে না। ইঞ্জিন ঘরে আর এই চেম্বারে খুব পাকাপোক্ত ভাবে 'বাগিং'-এর ব্যবস্থা করে রেখেছিল জ্যাস, আমাদের সমস্ত কথাই সে শুনতে পেত। আমি যা করেছি, আর দু'মিনিট সময় পেলে জ্যাস ওই কাজ করত। আমাকে খতম করে তুই কিছু বোঝার আগেই তোকেও শেষ করত। আমাদের

জ্যাস হল গিয়ে অপারেশন জিরোর চতুর পাণ্ডাদের একজন।

আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এ তুমি কতদিন আগে জেনেছ?

নির্লিপ্ত মুখে রঙ্গ মামা জবাব দিল, গোড়া থেকেই। প্রথম থেকে সব জেনে আর বুঝেই আমি জ্যাসের মানে অপারেশন জিরোর ফাঁদে পা দিয়েছি। পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে দেখালো। এটা চিনতে পারিস?

আমি বলে উঠলাম, এটা তো জ্যাসের হাতের সেই ওয়াটার প্রুফ পেল্লায় রিস্ট ওয়াচ।

মামা মাথা নাড়ল। হ্যাঁ। আবার খুব শক্তিশালী ট্রান্সমিটারও। আমাদের 'স্ট্রীম-লাইন' আবিষ্কার করা পর্যন্ত সমস্ত খবর এর মারফৎ জ্যাসের মাদার শিপের লোকেরা ঠিক ঠিক পেয়ে গেছে।

আমি হতভম্ব। জ্যাসের মাদার শিপ!

রঙ্গ মামা বলল, তুই তো বোকাই দেখছি। আমাদের বহু পিছনে পিছনে ওদের একখানা ছোট্ট জাহাজ সময় আর ঘন্টার হিসেব ধরে আসছে না? সী-হুক নিয়ে হিসেবের পাঁচ ঘন্টা আগে ডোবার নামে জ্যাস অমন বিগড়ে গেছল কেন? রাগ দেখিয়ে ভিতরের চেম্বারে গিয়ে সময় বদলের খবর পাঠিয়ে তারপর আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।

আমি বলে উঠলাম, কি সর্বনাশ, আমরা যেখানে ভেসে উঠব, পাঁচ ঘন্টা বাদে ওদের মাদার শিপ তাহলে সেখানে আসছে?

আমরা কস্মিনকালেও সেখানে আর ভেসে উঠব না। এরপর রাতের নির্জনে ছাড়া আমাদের আর ভেসে ওঠাই খুব নিরাপদ হবে না। ট্রান্সমিটারের সংকেত জানা থাকলে মাদার শিপকে উল্টো খবর দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। তা হবার নয় বলেই মাথার ওপর এখন আরো বড় খাঁড়া ঝুলছে। জ্যাসের কোনো খবর না পেয়ে ওদের মাথায় দুটো সন্দেহ ঢুকবে। এক—তিন জনেই আমরা সী-হুকের বা অন্য কোনো বিপর্যয়ের দরুন প্রাণ খুইয়েছি। দুই জ্যাসকে খতম করে সব ঐশ্বর্য নিয়ে আমরা সী-হুক নিয়ে

পালিয়েছি। দ্বিতীয় চিন্তাটা চট করে মাথায় ঢুকবে না, কারণ, সব জেনে বুঝে আমি তাদের ফাঁদে পা দিয়েছি এটা তারা ভাববে কি করে? কিন্তু 'স্ট্রীম-লাইন' আবিষ্কারের খবর পাওয়ার পরে আর সংকেত না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সন্দেহটাও তাদের হবেই। এখন তাদের সঙ্গে তো আর দুটো জাহাজ নেই, তারা কোনদিকে যাবে? সী-হক ভেসে ওঠার আশায় বড় জোর তারা একদিন অপেক্ষা করবে আর চারদিকে টহল দেবে। তারপর তারা কোনদিকে যাবে? দক্ষিণ ব্রেজিলের দিকে না উত্তরে লিসবনের দিকে? লোক চরিত্র সম্পর্কে আমার যদি কোনো জ্ঞান থেকে থাকে তাহলে তারা দক্ষিণে অর্থাৎ ব্রেজিলের দিকেই যাবে। প্রথম কারণ, চারশ' মাইল কম পথ, দ্বিতীয় কারণ, গা ঢাকা দেবার মতো নির্জন আর নিরাপদ স্থান ব্রেজিলের তুলনায় আর কোথাও নেই। তৃতীয় মোক্ষম কারণ, আমাদের পাসপোর্ট ব্রেজিলের। সকলের চোখে ধুলো দিতে হলেও পাসপোর্ট তো চাই-ই, নইলে ব্রেজিল ছাড়া অন্য জায়গায় আমরা উঠব কি করে আর বেরুবোই বা কি করে? ওরা তো ভাবতেও পারবে না এই বিশাল ঐশ্বর্য তোর মায়ের হুকুমে আমরা সরকারকে আর 'স্ট্রীম-লাইনের' সেই ঘা-খাওয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে ফিরিয়ে দিতে চলেছি।

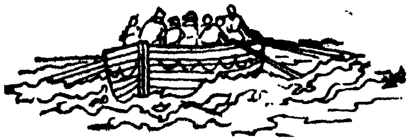
আমি হাঁ করে মামার মুখের দিকে চেয়ে আছি। মা লীলা তরফদার, তোমার তুলনা নেই। বাবার কলঙ্ক মোচন করতে হলে এছাড়া যে আর কোনো উপায় নেই, এটুকুও তোমার নির্বোধ ছেলের মাথায় ঢোকেনি।

রঙ্গ মামা বলল, তাহলে আমাদের খোঁজে মাদার শিপের অপারেশন জিরোর দল যাবে দক্ষিণে, আর আমরা যাব সোজা উত্তরে। লিসবনে ওদের অপারেশন আছে, লিসবনেও যাবনা, এমন কি পর্তুগালেও যাবনা! স্পেনের ছোট পোর্ট কাডিজে নামব আমরা। সেখান থেকে সোজা চলে যাব এরোপ্লেনে চেপে মাদ্রিড। সেখানে গিয়ে দেখবি বোম্বেটের সঙ্গে তোর মা সরকার পক্ষ আর

ইনসিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের রাজসিক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এমন কি কাডিজ-এও তোর মায়ের দেখা পেয়ে যেতে পারি।

সমুদ্রের তলায় আবার যেন আকাশ থেকে পড়লাম আমি। আমার মা আর বোম্বেটেকে স্পেনে দেখব!

নয়তো কি, অপারেশন জিরোর হাতে খুন হবার জন্য বম্বেতে পড়ে থাকবে? আমাদের বাগে পাবার পর তোর মায়ের ওপরেও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ত তারা? তোর মা সকলকে জানান দিয়ে কলকাতার টিকিট কেটেছে, আর আমি খুব গোপনে অন্য লোক মারফত তাদের দু'জনের স্পেনে ওড়ার টিকিট কেটেছি, পাসপোর্ট করেছি। আজ থেকে ঠিক পাঁচ দিনের দিন সকালে তোর মা স্পেনের সরকারকে আর ইনসিওরেন্স আপিসকে সব জানাবে। সেই রাতেই স্পেনের পোর্ট কাডিজ-এ পা দেব আমরা। কিন্তু এখন আর কোনো কথা নয়. ঢের বড় কাজ সামনে। জ্যাসের কথা যা শোনার, পরে শুনিশ'খন। কড়া কফি আর কিছু খাবার খেয়ে এবার ওপরের দিকে রওনা হয়েছি আমরা। সী-হকের ওজন এখন বেশি। তবু নামার থেকে উঠতে সময় প্রায় এক ঘণ্টা কম লাগল। সী-হক জলের ওপরে মাথা তুলল বেলা পৌনে বারোটায়।



কোথা থেকে কোথায় এলাম এ-যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। আবার আলো আবার সূর্য আবার মুক্ত বাতাস। পরের পাঁচ দিনের মধ্যে মোট চব্বিশ ঘণ্টাও রঙ্গ মামা জলের ওপর ভেসে থাকতে সাহস করেনি। যেটুকু চাঁদের আলো আর মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এসেছি তাও অতি নির্জনে গভীর রাত্রিতে। বেশির ভাগ সময় আমরা জলের তলায়। কারণ শত্রু পক্ষ বোকা নয়। হিসেব ভুল করে তারা দক্ষিণে পাড়ি দিলেও তাদের লিসবনের ঘাঁটিতে অন্তত বেতারে সমস্ত সমাচার জানিয়েই রেখেছে। অতএব এদিকেও কারো সজাগ দৃষ্টি নেই রঙ্গ মামা সেটা ধরে নিতে রাজি নয়। স্পেনের কাছাকাছি আসার পর সী-হককে আর মাথাই তুলতে দেওয়া হয়নি।

হ্যাঁ, এবারে আমরা যথার্থ শ্রান্ত, ক্লান্ত। আমাদের ওপর দিয়ে সমুদ্রের ঝড় গেছে, ভূমিকম্প গেছে, আরো ছোট-খাট অনেক দুর্যোগ গেছে। সেসব তুচ্ছ করলেও মাথার ওপর অনিশ্চয়তার সংকট। শেষ মুহূর্তে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যাব কিনা কে জানে?

এই পাঁচ দিন বেশির ভাগ সময় আমি রঙ্গ মামার পাশে বসে কাটিয়েছি। মামা এই পাঁচ দিনের মধ্যে দু' মিনিটও ঘুমোয় নি। এত শক্তি এত বুদ্ধি আর এমন স্নায়ুর জোর আমি কোনো মানুষের দেখিনি। এই নির্লোভ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তার জয় হবে না?

জ্যাস সম্পর্কে আমার মনে অনেক কৌতূহল ছিল। জ্যাস অপারেশন জিরোর পাণ্ডা একজন আর রঙ্গ মামা শুরু থেকেই সেটা জানত এ যেন বিশ্বাস্য নয়। রঙ্গ মামার মুখ থেকে অল্প অল্প করে সব শোনার পর বিশ্বাস হয়েছে।

…নিজের অর্থে বা সাহায্যে সমস্ত সরঞ্জাম-সহ ডিপ ডাইভিং সাবমেরিন নিয়ে কোনো কালে অ্যাটলান্টিকের তলা থেকে মামার হতে-পারে মামীকে উদ্ধার করা যাবে না, এ সত্যটা মামা স্থির বুঝেছিল। আর বাবার কলঙ্কমোচনও কোনোদিন সম্ভব হবে না তাহলে। একমাত্র পারা যায় দেশের সরকার এগিয়ে এলে। কিন্তু বিশ বছর বাদে যে-কোনো সরকারকে এ প্রস্তাব দিতে গেলে তারা কানে তো তুলবেই না, পাগল ভাববে। চোরাই হীরে আর সোনার কথা বললে বাবার অপবাদে নতুন করে ঘা পড়বে। তারা ধরে নেবে, বাবা লোভের বশবর্তী হয়ে এই চোরাই চালানের দায়িত্ব নিয়েছিল, দুর্যোগে পড়ার ফলে সব ভেঙে গেছে। বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে এক ভিনদেশী লোকের কথায় নির্ভর করে সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারে কান তো দেবেই না, মাঝখান থেকে সব জানাজানি হয়ে যাবে, কাগজে কাগজে মুখরোচক প্রস্তাবের খবর ছাপবে। কিন্তু সব উদ্ধার করে যদি তাদের হাতে সঁপে দেওয়া যায় তাহলেই সব কিছু বিশ্বাসযোগ্য হবে, আর বাবার এই রকমই ইচ্ছে ছিল তখন শুনলে কলঙ্কের বদলে বাবার গৌরবের কথাই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু টানা আঠের বছরের অবিরাম চেষ্টার পরে মামা সার বুঝল, এ-ভাবে কিছু হবার নয়। অথচ এই একটা আশা নিয়েই মা লীলা তরফদার বসে আছে, নিজের একমাত্র ছেলেকে তার ভাইয়ের যোগ্য দোসর তৈরি করেছে। শেষে এক দুঃসাহসিক প্ল্যান এলো রঙ্গ মামার মাথায়। বিশ্বাস একমাত্র একটি শক্তিশালী দলই করবে, আর সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে আসবে। সে ওই অপারেশন জিরোর দল। তারা জানে তাদের কি লোকসান হয়েছে। তারা জানে 'স্ট্রীম-লাইনের' একটি মাত্র মানুষ আশ্চর্য উপায়ে বেঁচে আছে, সে ওই জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার রঙ্গরাজ চন্দ্রভানকর। ক্যাপ্টেনের স্কুবা গীয়ারের কল্যাণে এই একটি মাত্র লোকের বেঁচে ফেরাটা তারা কখনোই সাদা চোখে দেখেনি। রঙ্গ মামা জানে, সুতো ছেড়ে তারা তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। অপারেশন জিরোর দল তার

ভাগ্নের ট্রেনিং-এর ব্যাপারগুলোও বরাবর লক্ষ্য করে আসছে। আর মামা কি উদ্দেশ্যে লিসবন আর ব্রেজিলে ঘোরে তাও তারা আঁচ করতে পেরেছে। মামা মরিয়া হয়ে ঠিক করল, জানতে বুঝতে না দিয়ে বাঘের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই, কাজ উদ্ধার করা ছাড়া গতি নেই। বোকার মতো অপারেশন জিরোর দলের কোনো কেউকেটা লোকের ফাঁদে পা দিয়েই সব-কিছুর ফয়সলা করবে। তাতে প্রাণ থাক আর যাক। এই সঙ্কল্প স্থির করেই শেষবারের মতো ব্রেজিলের স্যানটোসে পা ফেলল রঙ্গ মামা। সেখানে গেলেই অপারেশন জিরোর চর যে তার পিছনে লেগে থাকে সেটা খুব ভালো করেই জানে।

বড় হোটেলে আস্তানা নিয়ে খায়-দায় আর মজা করে দিন কাটায়। যেন ফুর্তি করতেই আসা সেখানে। শত্রুও সেধেই সেখানে হাজির হল, মামাকে খুব চেষ্টা করতে হল না। সে ওই জিম অ্যালবার্ট সিলভা, এক কথায় জ্যাস।

তিন দিনের জন্য মামার পাশের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিল। প্রথম দিনেই মামার সঙ্গে তার খাতির হয়ে গেল। স্টীম বোট মেরামতির কারখানা তার, শুনেই মামার সন্দেহ হল টোপ এগিয়ে এসেছে। কারণ, ডুবোজাহাজ তৈরি করে যাদের জলের তলার ঐশ্বর্য উদ্ধারের মতলব, প্রথম পরিচয়ে স্টীম বোট মেরামতির কারখানার কথা না বললে, মামার নজর কাড়বে কি করে? আর, স্টীম বোট মেরামতির কারখানা তাদের যথার্থই থাকা স্বাভাবিক, কারণ তাদের কারবারের আসল ঘাঁটি ব্রেজিল। সেই দেশের সর্বত্র চোরাই সোনাদানা আর চোরাই নেশার জিনিস লেনদেন করার জন্য নিজেদের একাধিক স্টীম বোট, এমন কি ছোট-খাটো স্টীম শিল্পও থাকার কথা।

মনের সংশয় মনে চেপে রঙ্গ মামাও জ্যাসের সঙ্গে খাতির করে ফেলল। বাইরে লোকটা ফুর্তিবাজ মানুষ খুব। আর মামাকেও তার খুব মজার মানুষ মনে হয়েছে। চেষ্টা করে ওই প্রথম দু'দিনের মধ্যে মামা তার কাছে আরো মজাদার মানুষ হয়ে উঠল। কয়েক গেলাস মদ গেলার পর জ্যাস আক্ষেপের সুরে বলল, টাকা-পয়সার

তার কোনো অভাব নেই, আর অঢেল টাকা করাটাই তার একমাত্র স্বপ্ন, কিন্তু ঘরে শান্তি নেই। ভারী দজ্জাল বউ। আর ছেলে মেয়েও তেমনি। কাজের নামে এমনি সপ্তাহে দু'দিন তিনদিন করে গা-ঢাকা দিয়ে যে কোনো হোটেলে ফুর্তি করে চাঙ্গা হয়ে আবার কাজের জায়গায় ফিরে যায়। এবারে এসে তার একটি মজাদার বিদেশী বন্ধু লাভ হল। দু'দিনে মামাকে অনেক খাইয়ে দাইয়ে বন্ধুত্ব পাকা করে জ্যাস চলে গেল। যাবার আগে তার কারখানায় যাবার নেমন্তন্নও করে গেল।

পরের সপ্তাহেই মামা তার স্টীম বোট মেরামতির কারখানায় গিয়ে হাজির হল। সমুদ্রের ধারে একটা বেশ বড়সড় জায়গা নিয়ে সত্যিকারের কারখানা তার। সকলের চোখে কারখানার সে-ই মালিক। মামাকে দেখে জ্যাস ভারি খুশি। খুব খাওয়ালো-দাওয়ালো, মজাদার বন্ধুর খাতিরে সে-রাতে বাড়িই গেল না। অপেরায় নিয়ে গিয়ে নাচ গান দেখালো। পরদিনই মামা তার কাছে প্রস্তাব করল, এদিকেই একটা সস্তার হোটেল দেখে দাও, যেখানে আছি সেখানে ভয়ানক খরচ।

জ্যাস জিগ্যেস করল, নিজের দেশ ছেড়ে ভবঘুরের মতো দূর দূর দেশে ঘুরে বেড়াও, তোমার টাকার জোর নেই?

মামা জবাব দিয়েছে, তেমন আর কই, খুব বেশি হলে বারো চোদ্দ লাখ…।

জ্যাস হাঁ, আরো চাই তোমার?

আরো ঢের বেশি চাই।

জ্যাস সানন্দে হাত মিলিয়েছে মামার সঙ্গে। সাবাস ভাই, আমার তোমার মতো ওই এক রোগ। টাকার গন্ধ পেলেই পাগলা হয়ে যাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ আমি দেদার খরচ করি, আর তুমি কেপ্পন।

পরে সাগ্রহে জিগ্যেস করেছে, তুমি এত টাকা কি করে রোজগার করলে?

মামা সব-কিছুর ঠিক ঠিক ফিরিস্তি দিয়েছে। শুনে জ্যাসের যেন বিশ্বাস হয় না, এরকম হাবাগোবা মূর্তি তোমার অথচ তুমি দেখি গুণী মানুষ একজন! আমার অনেক স্টীম বোটওয়ালার সঙ্গে খাতির আছে, চাকরি করবে?

মামা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, না রে ভাই, চাকরি করতে গেলেই মালিকদের বউরা আমাকে মজার মানুষ ভেবে ডাকাডাকি করে তখন মালিকরা রেগে যায় আমার ওপর, আর শেষে ঝগড়া হয়ে যায়। চাকরি আর না, ঘেন্না ধরে গেছে।

জ্যাস হেসে সারা।

সেই এলাকাতেই মামার থাকার হোটেল ঠিক করে দিল জ্যাস। আর তারপর থেকে দু'জনের দহরম-মহরম বাড়তেই থাকল। জ্যাস মজা পছন্দ করে, মামাও নিজের ঝুলির সমস্ত মজা উজার করে ঢেলে দিতে লাগল। যত দিন যায়, জ্যাসের হম্বি-তম্বি বাড়ে, মামা ফিরে জবাবের চাবুক ঝাড়লে রেগেমেগে চলে যায়। কিন্তু মজার লোভে ফিরে আবার না এসে বা না ডেকে পারে না মামাকে। মাস কয়েকের মধ্যেই রঙ্গ মামা নিঃসংশয় যে জ্যাস অপারেশন জিরোর বিশেষ কর্মী একজন! মেরামতির নামে যে সব স্টীম বোট আসে, ট্রায়েলের নামে সেগুলো বোঝাই হয়ে নিষিদ্ধ মাল চালান যায়, রঙ্গ মামা তাও বুঝে নিয়েছে। কিন্তু রঙ্গ মামার মুখ দেখে ভেতর কে বুঝবে?

এবারে ঘুরিয়ে টোপ ফেলতে লাগল জ্যাস। তাকে দেখলেই টাকার কথা বলে, অঢেল টাকার লোভটা বড় করে জাহির করে। যেন টাকাই তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। রঙ্গ মামা টাকা নিয়ে ঠাট্টা করলে রেগে যায়। বলে, টাকা হল গিয়ে দুনিয়ার সব থেকে সেরা জাদু, তুমি ইণ্ডিয়ান, তুমি এর মর্ম কি বুঝবে। আর শোনায়, অবস্থার উন্নতি করতে চায় যে, সে-ই তার প্রিয়পাত্র, বলে, তার সে-রকম টাকা থাকলে জীবন-যুদ্ধের সৈনিকদের সে দু'হাতে বিলিয়ে দিত। গরিবীয়ানার সঙ্গে তার কোনোরকম আপোস নেই।

সোজা টোপ ফেলল আরো কিছুকাল পরে। নিজে না বলে

অন্তরঙ্গ দুই একজনের মুখ দিয়ে খবরটা শোনালো মামাকে। ব্রেজিলের দুর্গম জঙ্গলে শিকারে যাওয়ার খবরটা। শুনলে মামা ছুটে আসবেই জানে। আসার পর জ্যাসের সেই ষণ্ডা-মার্কা দুই জঙ্গল-সহচরদের ঘায়েল করার ব্যাপারে মামার আসুরিক শক্তি দেখে সে সত্যিই অবাক হয়েছিল। আর এই থেকে শত্রু যে কত সেয়ানা তাও বুঝেছিল। তারপর, সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে মামার কাছে দুর্গম জঙ্গলে যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিল। হিংস্র জীব-জন্তুর হাড়ের পাহাড়ের সন্ধান পাওয়ার কথা বলেছিল মামাকে। সেই পাহাড়ের মালিক হয়ে বসতে পারলে হাড়ের ব্যবসায় লাখ লাখ টাকা কামাবার কথা বলেছিল।

আসলে এই উদ্দেশ্যের কথা বলে মামাকে সে বোঝাতে চেয়েছিল, সে রকম টাকার গন্ধ পেলে সে প্রাণের মায়া আর ভয়-ডর তুচ্ছ করে কোনো ভয়াল দুর্গম রসাতলেও ছুটে যেতে পারে।

হ্যাঁ, এবারে রঙ্গ মামা কিছু না বোঝার ভান করেই বিশ্বাসের এই টোপ গিলে আরো অজস্র গুণ বড় ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছিল তাকে। সাগর তলের এই বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান। অনেক টালবাহানা আর অবিশ্বাসের পরে যেন মামার কথায় বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করার পর শুনেছিল, মামা এই ঐশ্বর্য উদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়েই এতকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারপর প্রাপ্য অংশ নিয়ে কৃত্রিম বোঝা-বুঝি দু'জনের। রঙ্গ মামা চোদ্দ আনা ভাগ চেয়ে বসলেও জ্যাস রাজি হত শেষ পর্যন্ত। কারণ, কাজ শেষ হলে পরে উল্টে মামার প্রাণটিও খোয়া যাবে, এ তার থেকে বেশি আর কে জানে? কিন্তু বখরা নিয়ে কড়া বোঝা-বুঝি না করলে মামার সন্দেহ হবে, জ্যাস সেই অভিনয়ও সুন্দর করল, তারপর হার মেনে হাল ছাড়ল যেন।

মামার মনে কোনোরকম সন্দেহের ছায়া না পড়ে সেই জন্য বম্বে থেকে যাত্রা করার আগেও সংকেতে টেলিগ্রাম করেছে সে। শত্রুর চরের ভয়ে নানাভাবে সাবধান করেছে মামাকে। মামা তার সব

কথা ঠিক-ঠিক বিশ্বাস করেছে কিনা যাচাই করার জন্য লণ্ডনে সস্তার হোটেলে থাকতে বলেছে মামাকে। আর চর লাগিয়ে পরখ করেছে, মামা তাই করল কিনা।

হাবাগোবার মতো মামা তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। করে ব্রেজিলে এসেছে। রিও দ্য জেনেরিওতে সন্দেহ-জনক যে দু'জন লোক গায়ে পড়ে মামার সঙ্গে কথা বলেছিল, তাও জ্যাসের সাজানো ব্যাপার। আর জ্যাস তার সন্দেহের যেসব কারণ বলেছিল তা তো নিজের ইচ্ছেমতো ঘরে বসেই সাজানো। রঙ্গ মামার সব থেকে বড় বাহাদুরি জ্যাস সম্পর্কে আমাকে কিছু বুঝতে না দেওয়া। এত বড় শত্রুর সঙ্গেই অভিযানে চলেছি জানা থাকলে আমার আচরণ হাজার চেষ্টা করলেও এমন স্বাভাবিক হতে পারত কিনা সন্দেহ। মামার মুখে উল্টে তার প্রশংসা শুনে শুনে লোকটাকে সত্যিকারের উদার মহৎ আর খেয়ালী ধরে নিয়েছিলাম। তার সঙ্গে অনায়াসে একাত্মা হয়ে উঠেছিলাম। মামা ঠিক তাই চেয়ে ছিল। সী-হক নিয়ে ডোবার জায়গার পথে আসতে আসতেও নিজের বিবেকের দংশনের কথা বলেছিল মামা। বলেছিল, মাত্র ছ' আনা ভাগ দিয়ে জ্যাসকে ঠকানো হয়েছে, তার উদারতার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। বলেছে, ঐশ্বর্য হাতে এলে অন্য ব্যবস্থা করবে। তখন কে জানত, ভিতর থেকে সব শোনার কল জ্যাস নিজের পকেটে রেখেছে বলেই মামা ও-রকম বলছে! জ্যাস শুনেছে, আর মামাকে নীরেট ভেবে মনে মনে খুব হেসেছে হয়তো।

এখনো জ্যাসের সেই খোলা চোখ দুটোর কথা মনে হলে আমার রগ শির শির করে। আর, আমার মা? তারও কি তুলনা আছে? মায়ের কাছে মামা কিছুই গোপন করেনি। সমস্ত প্ল্যানই মায়ের জানা। অপারেশন জিরোর এক পাওার সঙ্গেই মামা এমন এক দুঃসাহসিক অভিযানে যাচ্ছে শুনে মা থমকেছিল। মামা বলেছে, শংকর থাক তাহলে আমি একলাই যাচ্ছি।···কিন্তু একটা কথা, তুমি অপারেশন জিরোর সমস্ত দলটার কথা ভাবছ, কিন্তু তাদের একজন ছাড়া কেউ

আমাদের টিকির নাগাল পাবে না। সমুদ্রের তলায় সেই একজন যদি আমাদের দু'দুটো লোককে ঘায়েল করতে পারে, তাহলে বেঁচে না থাকাই ভালো দিদি। মা বলেছে, একলা যেতে হবে না। শংকরকে নিয়ে যা।

পঞ্চম দিনের গভীর রাতে জলের তলা দিয়েই একেবারে পিছন দিক দিয়ে স্পেনের ছোট পোর্ট কাডিজের কাছাকাছি এসে রঙ্গ মামা সী-হককে তীরের দিকে চালিয়ে নিয়ে এলো। একশ ফুট গভীরে এসে থামল। তারপর জলের ওপরে ভেসে উঠল।

পোর্টের দিকে ফ্লাড লাইটের আলো ফেলতেই আমাদের কেমন মনে হল ওই পোর্ট কর্মতৎপরতর এই গভীর রাতেও। বহু আলো জ্বলছে।

হ্যাঁ, পোর্ট কাডিজ এই রাতে সজাগ, চঞ্চল। মাদ্রিদ থেকে বড় বড় সরকারী হোমরা-চোমরারা এরোপ্লেনে চেপে এই রাতের মধ্যেই এখানে এসে হাজিরা দিয়েছে। সেখান থেকে আলোর নিশানা দেখানো হল। নাবিকের সেই সংকেতের অর্থ, আমরা আসছি, তোমাদের খবর কুশল তো?

ফ্লাড লাইট নিভিয়ে জোরালো টর্চের আলো জ্বেলে রঙ্গ মামা সংকেতের জবাব পাঠালো, খুব ভালো। তোমরা এসো।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ বোঝাই দুটো স্টীম লঞ্চ এগিয়ে এলো সী-হকের দিকে।

...হ্যাঁ আমি ঠিকই দেখেছি। আমার মা লীলা তরফদার আর বোম্বেটেও আছে একটা লঞ্চে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারাও না এসে পারেনি।

পুলিশ আর হোমরা-চোমরাদের ঠেলে মা-কে যখন পেলাম, স্থান কাল ভুলে বাচ্চা ছেলের মতোই দু'হাতে আঁকড়ে ধরে কেঁদেই ফেললাম আমি।

তারপর দেখলাম, আমার মা লীলা তরফদার আনন্দে হাসছে। আমার মা আনন্দে কাঁদছে।

হ্যাঁ, আমার মায়ের এমনই সুন্দর ব্যক্তিত্ব যে কর্তৃপক্ষ মায়ের সব কথা বিশ্বাস না করে পারেনি। বিশ বছর আগের সেই জাহাজ-ডুবির কথা তো তারা জানেই। সেই ক্যাপ্টেনের স্ত্রী এসেছে। তার ছেলে আর ভাই সমুদ্রের তলা থেকে সব উদ্ধার করে নিয়ে কাডিজে আসছে শুনে তারা নির্বাক হতভম্ব প্রথমে। তখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুক না করুক অবহেলা করবে কি করে? তড়িঘড়ি তারা পোর্ট কাডিজকে তৈরি হবার আদেশ দিয়েছে। তারপর মা-কে আর বোম্বেটেকে সঙ্গে করেই উড়ে চলে এসেছে। আসার আগে মা সেই ঘা-খাওয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানির প্রধানদের সঙ্গে দেখা করেও সব বলে এসেছে। মায়ের স্থির বিশ্বাস কাজ শেষ করে আমরা নির্বিঘ্নে ফিরে আসবই। সেই কোম্পানির লোকেরাও বাতাস সাঁতরে ছুটে এসেছে।

ক্যামেরার মুহুর্মুহুঃ ফ্লাশ লাইটে আমাদের চোখ ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার আর কোনো দিকে চোখ নেই। আমি শুধু দেখছি— আমার মা আনন্দে হাসছে। আমার মা আনন্দে কাঁদছে।

পরে সেই রাজসিক অভ্যর্থনা, খবরের কাগজের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড, আর আমাদের বিপুল পুরস্কার লাভের কথা থাক। প্রথম নিরিবিলিতে রঙ্গ মামাকে পেয়েই কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমার একটা বড় কাজ বাকি আছে মামা—মা তাকালো আমার দিকে। রঙ্গ মামাও অবাক একটু। কি রে? মামার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম। তারপর বেশ করে দু'হাতে তার দু' পা জড়িয়ে ধরে সেই পায়ে নিজের কপাল ঠেকালাম।